৩

ভৌগোলিক আবিষ্কার ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি

আধুনিক ইউরোপের ইতিহাসে ভৌগোলিক আবিষ্কার আর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মধ্য যুগের শেষ দিকে ধনিক ও বণিক শ্রেণীর বিকাশের একটি পর্যায়ে মহাদেশের বাইরে ভূখন্ড খোঁজার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, এতে এক দিকে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও লোকবল সংগ্রহ, সম্পদের আহরণের মাধ্যমে পুঁজির সঞ্চয়ন ও সঞ্চালন ঘটানো হয়। ভৌগোলিক আবিষ্কার ইউরোপের সম্মুখে সেই সম্ভাবনার সম্ভারই খুলে দেয়। কীভাবে এই আবিষ্কারসমূহ সংঘটিত হয়েছিল এ সম্পর্কে একটি ধারণা বর্তমান ইউনিটের পাঠসমূহে দেওয়া হয়েছে।

এ ইউনিটের পাঠগুলো হচ্ছে -

- পাঠ - ১ : ভৌগোলিক আবিষ্কারের কারণ
- পাঠ - ২ : ভৌগোলিক আবিষ্কার
- পাঠ - ৩ : ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলাফল
- পাঠ - ৪ : কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে অগ্রগতি

পাঠ - ১

ভৌগোলিক আবিষ্কারের কারণ

এই পাঠ শেষে আপনি -

- ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বে বিভিন্ন সভ্যতার এবং দেশে দেশে কি সম্পর্ক ছিল সে সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলে ষোড়শ শতাব্দীতে বিভিন্ন সভ্যতা এবং দেশের মধ্যে যে নতুন সম্পর্ক স্থাপিত হলো সে সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন;
- ভৌগোলিক আবিষ্কারে কেন ইউরোপ নেতৃত্ব দিল সে সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- সমুদ্রযাত্রার যে সব প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আবিস্কৃত হয়েছিল সে সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারবেন।

কালের বিবর্তনে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সভ্যতা গড়ে উঠে। ইউরোপে দাঁড়িয়ে ছিলো খ্রিস্টান সভ্যতা বা খ্রিস্টান জগত। উত্তর আফ্রিকা বা পশ্চিম এশিয়ায় ছিল ইসলামি সভ্যতার লীলাভূমি, দূর প্রাচ্যে ছিল চৈনিক সভ্যতা আর সীমাহীন আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগর দ্বারা বিচ্ছিন্ন আমেরিকা বা দূরপ্রতীচ্যে গড়ে উঠেছিলো মায়া, আজটেক এবং ইনকাদের দ্বারা সুপ্রাচীন সভ্যতা। কিন্তু মজার ব্যাপার ছিল কয়েকটি সভ্যতার সঙ্গে সামান্য পারস্পরিক যোগাযোগ থাকলেও ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত অধিকাংশ সভ্যতা ছিল আলাদা ও বিচ্ছিন্ন। আমেরিকা ছিল সবার অলক্ষ্যে, সাহারা মরুভূমির দক্ষিণে আফ্রিকা সম্পর্কে ছিল খুবই কম তথ্য জানা ছিল। দূরপ্রাচ্য থেকে কিছু পণ্য ইউরোপে প্রবেশ করতো, ক্রুসেডের সময় সামান্য সময়ের জন্য পশ্চিম এশিয়ার সঙ্গে ইউরোপের কিছু যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ঐ পর্যন্তই। নিজেদেরকে নিয়ে ব্যস্ত এই সমস্ত জনগোষ্ঠি ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত নিজেদের ধর্ম, সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য নিয়ে আলাদাভাবে গড়ে উঠেছে। কিন্তু ইউরোপের নেতৃত্বে প্রায় পঞ্চাশ বছরের কম সময়ে এই পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা কলম্বাস, ম্যাগগিলান, ভাস্কো-ডা-গামার মতো কয়েকজন নাবিকের ভৌগোলিক আবিস্কার পৃথিবীটাকে বদলে দিয়েছিল। এই সব ভৌগোলিক আবিস্কার পৃথিবীর বিভিন্ন মানবগোষ্ঠী এবং সভ্যতার মধ্যে এক নতুন যোগসূত্রের বন্ধন এনে ছিলো। ইউরোপের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলো সারা পৃথিবীর উপর।

ভৌগোলিক আবিষ্কার শুধুমাত্র পৃথিবীটাকে ছোট করেই আনল না, যুগান্তকারী অর্থনৈতিক সম্পর্কও স্থাপন করলো দেশে দেশে। ইউরোপের সঙ্গে বহিঃবিশ্বের বিপুল সম্ভারের বাণিজ্য শুরু হলো, নতুন নতুন পণ্য ইউরোপে আসতে লাগলো, আর ইউরোপীয় পণ্য ক্রমান্বয়ে ঐসব দেশে রফতানি শুরু হলো। ইউরোপের ব্যবসার কেন্দ্র এতদিন ধরে ছিল ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল, এখন তা পরিবর্তিত হয়ে উত্তর আটলান্টিকে সরে গেলো। ক্রমেই ইউরোপীয় দেশসমূহের মধ্যে ঔপনিবেশিক প্রতিযোগিতা শুরু হয় এবং ইউরোপীয় দেশসমূহ এশিয়া, আফ্রিকায় এবং ল্যাটিন আমেরিকার দেশসমূহকে পরাজিত করে সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে। দাস ব্যবসা শুরু হয়। বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যের কারণে যখন ইউরোপ উত্তর উত্তর সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে চলছিলো তখন বাণিজ্যিক সংগঠনের কাঠামোর মধ্যেও পরিবর্তন আসে। আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থা,

ইনস্যুরেন্স, জয়েন্ট কোম্পানির আর্বিভাব সূচনা করে, আর এরই পথ ধরে শুরু হয় আধুনিক পুঁজিবাদের।

ভৌগোলিক আবিস্কারের কারণ সমূহ

এতোদিন পর্যন্ত যা হয় নি অর্থ্যাৎ পৃথিবীটাকে একটি সুতোর মালায় গাঁথার প্রচেষ্টা কেন শুরু হলো? এ সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্ক আছে। একদল ঐতিহাসিক মনে করেন রেনেসাঁই ভৌগোলিক আবিষ্কারের বড় কারণ। তাদের বক্তব্য হলো- রেনেসাঁর কারণে মানুষের মনে অনুসন্ধিৎসা এবং আত্মবিশ্বাসের জন্ম হয়। অজানা অদেখাকে জয় করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছে। তাঁরা বলে থাকেন ভৌগোলিক আবিষ্কারক কলম্বাস ছিলেন প্রখ্যাত রেনেসাঁসের চিত্র শিল্পী লিওনার্দো ভিন্সির সমসাময়িক। কিন্তু অনেক ঐতিহাসিক এমতের বিরোধিতা করেছেন। সমালোচকদের মতে রেনেসাঁসের মতাদর্শে বিশ্বাসীরা ধরেই নিয়েছেন অনুসন্ধিৎসা, অজানাকে জানার আগ্রহ মধ্যযুগীদের মধ্যে ছিল না। তাদের মতে মধ্য যুগীয় মানুষের মধ্যে আত্মবিশ্বাস এবং অদেখাকে দেখার তীব্র আকর্ষণ ছিল। রেনেসাঁয় পন্থীরা দাবি করেন অনেক নাবিক যারা পর্তুগাল ও স্পে স্নের থেকে বিশ্বজয়ে বের হয়েছিলেন তাদের জন্ম ছিলো ইতালীতে। কিন্তু তাঁরা একথা লুকিয়ে যান যে কলম্বাসের মতো অনেক ইতালীয় নাবিক আসলে জেনোয়ার অধিবাসী। কিন্তু ইতালিয় রেনেসাঁ জেনোয়ার অংশ গ্রহণ খুব কমই। ইতালীয় রেনেসাঁর সময় অর্জিত কিছু ভৌগোলিক জ্ঞান নিঃসন্দেহে ভৌগোলিক অভিযানে সহায়তা করেছিলো, কিন্তু রেনেসাঁই ভৌগোলিক আবিষ্কারের জন্ম দিয়েছে এটা সমালোচকরা মানতে রাজি নন। তাঁদের মতে মধ্যযুগের গর্ভে ভৌগোলিক অভিযানের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে।

(ক) বাণিজ্যিক কারণ

বেশির ভাগ ঐতিহাসিক মনে করেন যে ভৌগোলিক আবিষ্কারের সবচাইতে বড় কারণ বাণিজ্যিক সুবিধা আদায়ের জন্য ইউরোপের প্রচেষ্টার মধ্যে নিহিত ছিলো। পৃথিবীর পাঁচটি মহাদেশের ভিতর ইউরোপ সবচাইতে ছোট, স্বাভাবিকভাবে বহু পণ্যের জন্য ইউরোপকে নির্ভর করতে হতো অন্য মহাদেশের উপর। ইউরোপে অনেক জিনিস উৎপন্ন হতো যেমন খাদ্য শষ্য , ভেড়া, গরু, হাঁসমুরগী, শাকসবজি যা জনগণের খাবার জোগানের জন্য যথেষ্ট ছিল। এছাড়া নির্মাণ সামগ্রী হিসেবে প্রচুর কাঠ, পাথর, কয়লা, লোহা, তামা, টিন ইত্যাদিও প্রচুর ইউরোপে পাওয়া যেতো। এতদসত্ত্বেও ইউরোপকে অনেক প্রয়োজনীয় দ্রব্যের জন্য অন্য মহাদেশের ওপর প্রাচীন কাল থেকেই দ্বারস্থ হতে হচ্ছিল। কিন্তু কিছু কিছু সামগ্রী ইউরোপে একদম উৎপন্ন হতো না, যেমন কিছু প্রকার কাঠ, তুলা, চিনি ইত্যাদি। কিছু কিছু দ্রব্য ইউরোপে উৎপন্ন হলেও এগুলির পর্যাপ্ত সরবরাহ ছিল না। সিল্ক, স্বর্ণ, রুপা, মূল্যবান পাথর উপরে উল্লেখিত অনেক গুলি সামগ্রীর জন্য এশিয়ার ওপর নির্ভরশীল ছিল। তবে যে জিনিসটির জন্য ইউরোপ সবচাইতে বেশি এশিয়ার ওপর নির্ভরশীল ছিল তা হলো মশলা। গোলমরিচ, দারুচিনি, আদা, মরিচ,জয়ফল, লবঙ্গ, শুধুমাত্র গ্রীষ্মমন্ডলীয় দক্ষিণ পূর্ব-এশিয়ায় জন্মায়। ইউরোপ এগুলো আমাদের দেশের মতো সুস্বাদু খবার তৈরি জন্য তা কিন্তু নয়। তখন ইউরোপে রিফ্রিজারেটর আবিষ্কৃত হয় নি, মাংস সংরক্ষণের জন্য মশলার প্রয়োজন ছিল, তখন লবন দিয়ে মাংস সংরক্ষণ করা হতো, কিন্তু তা অনেকেই পছন্দ করতো না।

পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া থেকে মশলা, চীন থেকে সিল্ক, ভারত থেকে তুলা ও রত্নের চাহিদা এগুলোর সরবরাহের তুলনায় বেড়ে যাচ্ছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে প্রাচ্য থেকে দ্রব্য সামগ্রীর আমদানি সরবরাহে কয়েকটি কারণে অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। কিছু কিছু দ্রব্য পশুর পিঠে করে বিরাট পথ পাড়ি দিয়ে ইউরোপে পৌঁছাত, কিছু পণ্য আরবদের ছোট জাহাজে করে লোহিত সাগরে পৌঁছত, তারপর তা স্থলপথে ভূমধ্যসাগরে পৌঁছাত, সেখান থেকে ঐ-সব পণ্য আবার জাহাজে করে ইউরোপে পাঠানো হতো। চীন থেকে ইউরোপে পণ্য পৌছতে প্রায় তিন বছরের মতো সময় লাগত। তারপর আরব, ভেনিশীয় এবং জেনোয়ার মধ্যসত্ত্ব ভোগীদের কারণে দ্রব্যাদির দাম বেশি পড়ত। **দ্বিতীয়তঃ** ভূমধ্য সাগরের পূর্বাঞ্চল একাদশ শতাব্দী থেকে তূর্কি মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে আসতে থাকে। ইউরোপগামী সমস্ত বাণিজ্য এই সব এলাকা দিয়ে তাদের গন্তব্যে পৌছাত। তূর্কিরা এসব পণ্যের উপর ট্যাক্স আরোপ করাতে পণ্যের দাম বেড়ে যেতে লাগল। ইউরোপীয় অনেক ব্যবসায়ী ভয় পেতে লাগলেন যে তুর্কীরা চাইলে তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকায় বাণিজ্য পথ একেবারে বন্ধ করে ইউরোপীয় বাণিজ্যে বিপর্যয় ঘটাতে পারে। ইউরোপীয় বণিকদের আশঙ্কা সত্যে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিল যখন ১৪৫৩ সালে তুর্কিদের হাতে কনস্টানটিনোপলের পতন হলো। যেহেতু দূরপ্রাচ্যের দ্রব্যের চাহিদা বেড়েই চলেছিলো আর সে অনুযায়ী সরবরাহ অনিশ্চিত এবং অপর্যাপ্ত হয়ে পড়ছিলো, তাই পশ্চিম ইউরোপের দেশ বিশেষ করে পুর্তগিজ এবং স্পেন দেশীয় বণিকরা চাইছিল ইউরোপীয় চাহিদার উৎস মূলে প্রবেশ করে ইতালীয় ও আরব মধ্যসত্ত্বভোগী বণিকদের বাদ দিয়ে এবং তুর্কিদের নিয়ন্ত্রণ এড়িয়ে কিভাবে সরাসরি বাণিজ্য করতে পারে। স্থল পথে চীন ও ভারতে পৌঁছা বিপদ সঙ্কুল কেননা মধ্য এশিয়ার অস্থিশীল এবং দাঙ্গাহাঙ্গামাপূর্ণ অঞ্চল অতিক্রম করা সহজসাধ্য ছিলো না। তাছাড়া রেল আবিষ্কারের পূর্বে নৌপথেই মালামাল আনা নেওয়া করা অপেক্ষাকৃত সস্তা ছিল।

(খ) জাতীয় রাজাদের স্বপ্ন

শুধুমাত্র ব্যবসায়ীদের মনে দূরপ্রাচ্যের সঙ্গে সরাসরি বাণিজ্যের কথা মনে হচ্ছিল না, খ্রিষ্টান জগৎ ভেঙ্গে যে সব জাতীয় রাজারা বিশেষ করে পশ্চিম ইউরোপ শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন তারাও চাচ্ছিলেন উচ্চ মুনাফা প্রদান করতে পারে এমন নতুন নতুন বাণিজ্য পথ আবিষ্কৃত হউক। এইসব রাজা যাজকদের এবং ভূস্বামীদের তুলনায় শক্তিশালী হতে চাচ্ছিলেন, আর এ জন্য প্রয়োজন ছিল সম্পদের স্বর্ণ ও রোপ্যের প্রচুর মজুদ, যদি রাষ্ট্রীয় কোষাগারে থাকে তাহলে রাষ্ট্র সামরিক এবং নৌশক্তিতে বলীয়ান হতে পারে। পর্তুগালের রাজা যেমনটি ভারতবর্ষে আসার পথ খুঁজছিলেন এবং ভারতে আসার পথ পাওয়ার পর দূর প্রাচ্যের বাণিজ্যিক উপর একছত্র অধিকার বা মনোপোলি কায়েম করেছিলেন। স্পেনের রাজা আমেরিকা মহাদেশের উপর বাণিজ্য কর্তৃত্ব স্থাপন করতে চেয়েছিলেন যেন স্পেনীয় রাজতন্ত্র শক্তিশালী হয়। আবার ইউরোপের অন্য শক্তিশালী রাজারা বিশেষ করে ডাচ, ফরাসি এবং ইংরেজ সম্রাটরা পর্তুগিজ এবং স্পেনীয় একছত্র বাণিজ্য অধিকার ভেঙ্গে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য তাদের দেশের নাবিক এবং ব্যবসায়ীদেরকে উৎসাহিত করেছিলেন। এইভাবে নতুন নতুন বাণিজ্য পথ এবং অজানা দেশ ইউরোপের নজরে আসতে থাকে। নতুন দেশ আবিষ্কার এবং তার ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা ইউরোপীয় জাতীয়তার স্মারক চিহ্ন হিসেবে পরিগণিত হতে লাগল।

ধর্মীয় কারণ

বাণিজ্যিক সুবিধা এবং দেশকে শক্তিশালী করার চিন্তায় যখন ব্যবসায়ী এবং রাজারা বিভোর, তখন আর এক দল লোক ভিন্ন একটি কারণে ইউরোপের বাইরে তাদের প্রভাব বিস্তারে সচেষ্ট ছিল। এরা হচ্ছেন ধর্মগুরু, পোপ, বিশপ এবং চার্চের সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য যাজকরা। খ্রিস্টধর্মের ছায়াতলে স্থান দেওয়ার জন্য, বাইবেলের বাণী এশিয়া আফ্রিকায় এবং ল্যাটিন আমেরিকায় ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য ইউরোপীয় যাযকরা মরিয়া হয়ে উঠেছিলো। খ্রিস্টান ধর্ম বরাবরই একটি মিশনারি বা প্রচারকামী ধর্ম। দ্বাদশ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত যাজকরা ক্রুসেডের যোদ্ধাদের সাথে মিলিত হয়ে ইসলাম থেকে নিকট প্রাচ্যকে ছিনিয়ে আনার প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইউরোপকে খ্রিস্টান বানিয়ে সমস্ত খ্রিস্টান মিশনারিরা ক্রমে ক্রমে এশিয়া এবং আফ্রিকার দিকে নজর দিচ্ছিলো। ব্যবসায়ীরা তো এই শতাব্দীতেই এই সব অঞ্চলে বাণিজ্য দখল করতে চাচ্ছিল। ফলে ব্যবসায়ী এবং মিশনারিরা একত্রিত হয়ে তাদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পৃথিবীময় চষে বেড়াতে লাগল। অন্য কথায় ধর্মের প্রয়োজন এবং ব্যবসার দাবি একত্রিত হয় ষোড়শ শতাব্দীতে বিশ্ব যোগাযোগের বিপ্লবী অধ্যায়ের সূচনা করল। যেসব স্বৈরশাসকরা ব্যবসায়ী এবং নাবিকদেরকে অভিযানে বের হওয়ার জন্য সাহায্য সহোযোগিতা করছিলেন তারা ব্যবসা বাণিজ্য দ্বারা সম্পদ লাভের সাথে সাথে ধর্মপ্রচারের আকাংক্ষাও করছিলেন।

ভৌগোলিক জ্ঞান

ব্যবসা বা ধর্মপ্রচারের আকাংক্ষা হলেও দিগ্বিজয় সম্ভব হয় না, ভৌগোলিক জ্ঞান এবং দিক নির্ণয়ক যন্ত্রপাতির উন্নতি ছাড়া দেশ আবিষ্কারের দুঃসাহসিকতা কার্যকরী হতে পারে না। এ রকম জ্ঞান মধ্যযুগের শেষ ভাগ থেকে ইউরোপীয়রা নিজেদের অভিজ্ঞতা এবং বিভিন্ন জাতি। বিশেষ করে আরব বণিকদের কাছ থেকে সংগ্রহ করছিলো। ত্রয়োদশ শতকে খ্রিস্টান কয়েকজন দূতকে পোপ মধ্য এশিয়ার মঙ্গোল খাঁনদের দরবারে প্রেরণ করেছিলেন। ভেনিসের পোলো পরিবারের তিন ভাই চীন দেশে গিয়েছিলেন। এদের একজন মার্কো পোলো কুবলাই খাঁর দরবারে দীর্ঘ সতেরো বছর কাটিয়েছিলেন। আরেক জন উৎসাহী ধর্ম যাজক, মন্টি-করবিনো প্রথমে মঙ্গোলদের সঙ্গে কিছুদিন কাটিয়ে পরে ভারতের মাদ্রাজে একটি খিস্টান মিশন প্রতিষ্ঠা করে সর্বশেষে চীন পাড়ি দিয়ে পিকিং-এ বসবাস শুরু করেন। পোপ ১৩০৭ সালে তাঁকে চীনের রাজধানীর আর্ক বিশেষজ্ঞ হিসেবে নিয়োগ দান করেন। পরে তাঁর পথ ধরে কয়েকজন ইটালীয় ব্যবসায়ী দূরপ্রাচ্যে চলে আসেন। ফ্লোরেন্সের এক ব্যবসায়ী ''A Merchants' hand book'' নামক এক গ্রন্থে পূর্ব ও পশ্চিমের সকল বাণিজ্যিক রাস্তার ইঙ্গিত দিয়েছেন। একজন ভেনিসিয়ান ব্যবসায়ী তাঁর গ্রন্থ ''Secrets of the Faithful Crusuderচ-এ তাঁর দেখা কয়েকটি এশীয় শহরের বর্ণনা দিয়েছেন। ত্রয়োদশ এবং চর্তুদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয়দের এসব প্রচেষ্টা ক্ষণস্থায়ী হলে পরবর্তী কালের জন্য এগুলি সূদুর প্রসারী ভূমিকা রেখেছিলো। তাদের ভ্রমণ বৃত্তান্ত গুলোতে চীন ও ভারত সম্পর্কে চিত্তাকর্ষক বর্ণনা রয়েছে। যেমন মার্কো পোলোর ভ্রমণ নামক গ্রন্থে চীন, বার্মা ও জাপান সম্পর্কে বিবরণ রয়েছে। উল্লেখ্য, কুবলাই খাঁ মার্কো পোলোকে তাঁর দূত হিসাবে জাপান ও বার্মাসহ বিভিন্ন দেশে প্রেরণ করেছিলেন । এসব ভ্রমণ কাহিনীগুলোতে সব সময় সত্যি কথা লিখিত হয়েছে এমনটি নয়। ভ্রমণকারীরা লিখেছেন এশিয়াতে তারা এমন লোক দেখেছেন যাদের একটি মাত্র পা রয়েছে, কারো মাথার মধ্যে চক্ষু,

আবার কারো মাথা নেই, তাদের মুখটা বুকের মাঝে। এমনও বর্ণনা রয়েছে যেখানে বলা হয়েছে এশিয়াতে একধরনের লোক বাস করে যাদের মাথা কুকুরের মাথার মতো। তাদের আনা কাপড় সম্পর্কে ভ্রমণকারীরা লিখেছেন এক ধরণের গাছে ফুলের মতো জন্মানো মেষের পশম থেকে এগুলো প্রস্তুত। সে যাই হোক, তাদের ভ্রমণ কাহিনী পাঠ করে ইউরোপীয় নাকিদের মধ্যে প্রাচ্য দেশগুলোতে বিশেষ করে ক্যাথিতে (চীনের অপর নাম) পৌছার আগ্রহ বাড়তে থাকে। জানা যায় পর্তুগালের যুবরাজ নাবিক হেনরী মার্কো পোলোর ভ্রমণ পাঠ করে এশিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের উৎসাহী হয়ে ছিলেন। ভাস্কো-ডা-গামা'র নিকটে 'মার্কো পোলোর ভ্রমণ-কাহিনী' টি ছিল। মার্কোপোলোর বর্ণনামতো প্রাচ্যদেশীয় মণিমুক্তার ভান্ডার ইউরোপীয় নাবিকদের কল্পনা আন্দোলিত করতে থাকে। যদি ইউরোপীয়রা স্থলপথে নিরাপদে সেখানে না পৌঁছতে না পারে তবে তাদেরকে অবশ্যই জলপথে ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে বা ক্যাথিতে পৌঁছুতে হবে।

দিক নির্ণয়ের জ্ঞান ও যন্ত্রপাতি

এককালে বিশ্বাস করা হতো পৃথিবীটা সমতল এবং একটি প্লেটের মতো গোলাকার। পৃথিবীর উপর যদি কেউ পরিভ্রমণ করে এক সময় সে কিনারা দিয়ে পড়ে যাবে। মধ্যযুগে ভূগোল সম্পর্কে নতুন নতুন জ্ঞান বাড়ার সাথে সাথে মানুষ আর এসব কল্পকাহিনী বিশ্বাস করছিলো না। বরং বিশেষজ্ঞরা ক্রমে মনে করতে থাকে যে পৃথিবী বৃত্তাকার এবং অক্ষরেখার উপর ঘুরছে। এটা বলা হতে লাগলো যে ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ আটলান্টিকের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত। সুতরাং ইউরোপ থেকে জাহাজে করে সোজা পশ্চিমে গেলেই পূর্ব এশিয়ায় পৌছানো যাবে। একই সঙ্গে এও বিশ্বাস করা হতো যে ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং চীনে আসার ক্ষুদ্রতর সমুদ্র পথটা পাওয়া যাবে ইউরোপের উত্তর পূর্ব অথবা আফিকার দক্ষিণ দিক বরাবর। পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইউরোপের নাবিকের নৌচালনা সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করতে পেরেছিলেন। ইটালির নাবিকেরা ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে কম্পাসের ব্যবহার শুরু করেন। ধ্রুবতারার উচ্চতা মাপার জন্য আরবদের আবিষ্কৃত এ্যাস্ট্রেল্যাব নামক এক প্রকার যন্ত্রের সাহায্যে ইউরোপীয়রা নিরক্ষ রেখা থেকে কৌণিক দূরত্ব (অক্ষাংশ) মাপতো।

নৌপথের চার্ট ও ম্যাপের ব্যাপক প্রচলন শুরু হয়। মহাসমুদ্রে আগের মতো নাবিকরা হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা তখনও ছিল। কিন্তু এ সময়ে তাঁরা সাহসের সঙ্গে অভিযানে বের হতে পারত, কেননা হারিয়ে গেলেও তাঁরা জানতেন যে মহাউত্তাল সাগরে তাদের অবস্থান কোথায়। ভৌগোলিক জ্ঞান আর নাবিকের যন্ত্রের উপর সাহসে ভর করে ইউরোপীয় নাবিকরা গৌরব আর ভাগ্যের লোভে আটলান্টিকের আফ্রিকার উপকূলে কিম্বা অজানা সমুদ্রের বুকে তরী ভাসাল। আর এই ভাবেই পৃথিবীটাও আধুনিক জগতে প্রবেশ করল।

সারসংক্ষেপ

ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপের নেতৃত্বে ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলে পৃথিবীর চেহারাটাই পালটে গেলো। আগে যেখানে এক সভ্যতা আরেক সভ্যতা বা এক দেশ আরেক দেশ সম্পর্কে খুব একটা জানতো না তার অবসান হয়ে সভ্যতা ও দেশ সমূহ খুব কাছাকাছি এসে গেলো। এই আবিষ্কারের ফলে ইউরোপীয় ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণের অধীন হয়ে পড়ল সারা পৃথিবী। মূলত: বাণিজ্যিক সুবিধা লাভের জন্য বিশেষ করে প্রাচ্য দেশসমূহ থেকে মশলা, সিল্ক, মূল্যবান পাথর, তুলা সহজে ও সস্তায় নেওয়ার জন্য প্রচেষ্টার মাঝেই ভৌগোলিক আবিষ্কারের শুরু। পরে বাণিজ্য ছাড়া ধর্মীয় কারণ, রাজাদের অভিলাস ইত্যাদি কারণে ইউরোপীয়রা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। ভৌগোলিক জ্ঞান এবং নাবিকদের জন্য বিভিন্ন যন্ত্রপাতির আবিস্কার ভৌগোলিক আবিষ্কারকে সহায়তা করেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। ভৌগোলিক আবিষ্কারের প্রচেষ্টা শুরু হয় -

(ক) একাদশ শতাব্দীতে (খ) দ্বাদশ শতাব্দীতে
(গ) ত্রয়োদশ শতাব্দীতে (ঘ) ষোড়শ শতাব্দীতে

(২) মশলা পাওয়া যেতো -

(ক) আমেরিকায় (খ) চীনে
(গ) আরবে (ঘ) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়

(৩) ইউরোপীয়দের মশলার প্রয়োজন ছিল -

(ক) মাংস সুস্বাদু করতে (খ) মাংস সংরক্ষণ করতে
(গ) নানা খাবার তৈরি করতে (ঘ) ঔষধ বানাতে

(৪) মার্কো পোলো কোন দেশের নাগরিক ছিলেন -

(ক) চীনের (খ) ভেনিসের
(গ) ভারতের (ঘ) ইংল্যান্ডের

রচনা মূলক প্রশ্ন

১। ইউরোপীয় ভৌগোলিক আবিষ্কার পিছনে যে সব বাণিজ্যিক কারণ ছিল তা আলোচনা করুন।

২। যে সব ভৌগোলিক জ্ঞান বৃদ্ধি ও সমুদ্র যাত্রার প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের কারণে ভৌগলিক আবিস্কার সহজ হয়েছিলো সে সম্পর্কে আলোচনা করুন।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর

১। (খ), ২। (ঘ), ৩। (খ), ৪। (খ)

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। ভৌগোলিক আবিস্কার সম্পর্কে রেনেসাঁস মতবাদ সঠিক নয় কেন?

২। ধর্মীয় কারণ কীভাবে ভৌগোলিক আবিষ্কারেকে প্রভাবিত করেছে।

সহায়ক গ্রন্থাবলী

1 Edward Mcnall Burns, Robert E. Lerners, Standish Meacham, Western Civilizations : Their History and Culture. (New York : Norton, 1980)

2 Carlton. I.H. Hayes, Modern Europe to 1870 (New York : Macmillan, 1958).

মানচিত্র

পাঠ - ২

ভৌগোলিক আবিষ্কার

এই পাঠ শেষে আপনি জানাতে পারবেন -

- ইউরোপীয়দের বিভিন্ন দেশে যাওয়ার জলপথ আবিষ্কারের কাহিনী জানতে পারবেন।
- পর্তুগিজ নাবিক ভাস্কোডাগামা ভারতে আসার পথ কিভাবে আবিস্কার করল সে সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- কলম্বাস কি করে ভারতে আসার পথ আবিষ্কার করতে গিয়ে আমেরিকা আবিষ্কার করলেন সে সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- স্পেনীয়রা ভারতে আসার রাস্তা না পেলেও, কিন্তু আমেরিকা আবিষ্কার তাদের সে দুঃখকে কীভাবে ভুলিয়ে দিলো সে সম্পর্কে জানতে পারবেন।

ইউরোপ যখন দ্বিগবিজয়ে বের হয় তখন রাজনৈতিক দিক থেকে তাদের ছিল করুণ অবস্থা। তাদের শত্রট্ট তুর্কি মুসলমানদের আঘাতে ইউরোপীয় দেশগুলো ছিল পর্যুদস্ত, তাদের অস্তিত্ব ছিল হুমকির সম্মুখীন। ১৪৫৩ সালে তুর্কি সুলতান দ্বিতীয় মুহাম্মদদের হাতে কনস্টান্টিনোপলের পতন হয়। সার্বিয়া তুর্কিদের দখলে যায় ১৪৫৯ সালে, আলবেনিয়া একই ভাগ্য বরণ করে ১৪৭০ সালে। পশ্চিম ইউরোপীয়দের চরম দুঃস্বপ্ন শুরু হয় যখন তুর্কিরা ১৪৮০ খ্রিস্টাব্দে ইতালিতে পদার্পণ করে। ইতালিয় শহর ওটরান্টো তাদের দখলে আসে। ১৪৮১ খ্রিস্টাব্দে সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদের মৃত্যু হলে তুর্কিরা ইতালি ত্যাগ করে। কিন্তু ইউরোপীয়রা আশঙ্কায় দুলতে থাকে এই ভেবে যে তুর্কিরা আবার অক্রমণ করবে। পোপ দ্বিতীয় পিয়াস তুর্কিদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গঠন করতে গিয়ে দুঃখে বলে উঠেছিলেন ''আমি কোনো আশার আলো দেখতে পাচ্ছিনা''। একদিকে ইউরোপ যখন শুধুই অন্ধকার দেখছিলো তখন অন্যদিকে ইউরোপের আশার আলো জ্বলে উঠেছিলো। কিছু দুঃসাহসী পর্তুগিজ এবং স্পেনীয় নাবিক উত্তাল আটলান্টিক সাগর পাড়ি দেয়া শুরু করে। তাদের আবিষ্কার শীঘ্রই ইউরোপকে বিশ্বের প্রভু বানাবার রাস্তা তৈরি করে দিলো।

পর্তুগিজদের আবিষ্কার

ভৌগোলিক আবিষ্কারের পথে পর্তুগিজরা ছিল পথ প্রদর্শক। ইউরোপের দক্ষিণ পশ্চিম কোণায় এবং আটলান্টিক মহাসাগরে অবস্থিত পর্তুগালের কিছু কিছু সামুদ্রিক অভিযান আগে থেকেই পরিচালিত হচ্ছিল। এক সময় জিব্রাল্টার প্রণালী অতিক্রম করে স্পেনীয় মুসলিমদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। তারা আরো দক্ষিণে নৌযান চালিয়ে অগ্রসর হওয়ার কথা ভাবছিলো। পুরো আফ্রিকা মহাদেশ সম্পর্কে তাদের জ্ঞান ছিল খুবই সীমিত। কিন্তু তারা ধারণা করেছিল যে মহাদেশটি বিশাল ও বিপদসঙ্কুল। তারপরও তারা ভাবত আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল ধরে দক্ষিণে কিছুদূর অগ্রসর হলে মহাদেশটির সর্বদক্ষিণের বিন্দুটি অতিক্রম করে তারপর পূর্ব দিকে জাহাজ চালিয়ে গেলে তারা তাদের স্বপ্নের ভারত ও চীনে পৌঁছানো যাবে, এইভাবে তারা ইতালিয় নগরীগুলো এবং মুসলিম বাণিজ্য বহরের উপর নির্ভরশীলতার হাত থেকে রক্ষা পাবে। চর্তুদশ শতাব্দীর

মধ্যভাবে তারা আটলান্টিক দ্বীপ মাদেইরা (Madeira) ও আজোরেস (Azores) দখল করে এবং মদ ও চিনির ব্যবসা করে প্রচুর লাভবান হয়।

পর্তুগিজদের ভারতে এবং চীনে আসার স্বপ্নকে যিনি বাস্তবে রুপায়িত করার চেষ্টা করেন তিনি হচ্ছেন পর্তুগিজ যুবরাজ হেনরি নেভিগেটর (১৩৯৪-১৪৬০ খ্রি:)। নেভিগেটর মানে হচ্ছেন নৌপরিব্রাজক। কিন্তু হেনরি তেমন কিছু ছিলেন না। কিন্তু তাঁর হৃদয় মন জুড়ে ছিলো প্রচলিত ভৌগোলিক তত্ত্বগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল কিভাবে খ্রিস্টান ধর্মকে ছড়িয়ে দেয়া যায় এবং তাঁর দেশের সীমানা ও সম্পদ বাড়ানো যেতে পারে। তিনি নাবিকদের জন্য একটা স্কুল খুলে ছিলেন এবং সেখানে জড়ো করেছিলেন দক্ষ ও প্রতিভাবান নাবিক এবং ভূগোলবিদদের। এই স্কুল থেকে তিনি বছরের পর বছর ধরে ব্যবসায়ী, ধর্মপ্রচারক ও যোদ্ধাদের দিয়ে অনেক নৌঅভিযান প্রেরণ করেছিলেন। হেনরির সময় পর্তুগিজ জাহাজগুলো পশ্চিম আফ্রিকার উপকূল ধরে দক্ষিণের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। পর্তুগিজ নাবিকেরা ক্রমাগত উর্ধ্বমুখী গরমকে উপেক্ষা করে কিছু দুর্গ ও বাণিজ্য ঘাঁটি স্থাপন করতে সমর্থ হয়েছিলো। কি প্রচন্ড গরম আর বিপদসঙ্কুল অভিযানে তারা বেরিয়েছিলো পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের একটি বিবরণ থেকে তা কিছুটা অনুমান করা যায়। এই বর্ণনায় লিখা রয়েছে "কয়েক বছরের রসদপত্র ভর্তি করে চারটা জাহাজ রওয়ানা হয়। তিন বছর পর একটি জাহাজ ফিরে আসে। ঐ জাহাজের অধিকাংশ নাবিকই মারা যায়। যারা বেঁচে ছিলো তাদেরকে মানুষ বলে মনেই হতো না। তাদের মাংস ও চুল খসে পড়ে। হাতের ও পায়ের আঙ্গুলে নখ ছিল না। তাদের মাথার কোঠরে চোখ ঢুকে পড়েছে এবং তারা কুচকুচে কালো হয়ে গিয়েছিলো। তারা যে প্রচন্ড গরমের কথা বলছিলো সে অনুযায়ী জাহাজ ও নাবিকদের পুড়ে যাওয়া থেকে রক্ষা পাওয়াই ছিল আশ্চার্যজনক। তারা আরো বলছিল তারা কোনো বাড়ি বা মাটির দেখা পাচ্ছিল না। এক সময় তাদের পক্ষে আর জাহাজ চালানো সম্ভব ছিল না, কেননা তারা যতই এগুচ্ছিলো ততই গরম বাড়ছিলো আর সমুদ্র উত্তাল হচ্ছিলো। তাদের মনে হচ্ছিল তাদের অন্য যে জাহাজ গুলো বহুদূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছে তা আর ফিরে আসবে না।" এরকম ভয়াবহ বিবরণ পড়ার পরও নাবিকরা নতুন নতুন অভিযানে বের হচ্ছিল। হেনরির জীবদ্দশায় পর্তুগিজ নাবিকরা আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলের উত্তরাংশের অর্ধেকে অভিযান সম্পন্ন করেছিল এবং গোল্ড কোস্ট (বর্তমান ঘানা) ও দাস ব্যবসার উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছিলো।

১৪৭৭ খ্রিস্টাব্দে Bartholomew Diaz নামে এক পর্তুগিজ নাবিক আফ্রিকার সর্ব দক্ষিণের বিন্দুতে পৌছাতে পেরেছিলেন। তিনি যখন ওখানে পৌছেন তখন প্রচন্ড ঝড়ের কবলে পড়েন। তাই ঐ স্থানের নাম দিয়েছিলেন "ঝড়ের অন্তরীপ"। পর্তুগালের রাজা দ্বিতীয় জন এর মধ্যে আশার আলো দেখতে পান এবং এর নাম রাখেন "উত্তমাশা অন্তরীপ"। রাজা জন আরো কিছু পরিকল্পনা করেন যেন উত্তমাশা অন্তরীপ হয়ে পর্তুগিজরা ভারতের দিকে রাস্তা খুঁজে পায়।

রাজা জনের উত্তরাধিকারী রাজা প্রথম ম্যানুয়েলের আনুকূল্যে ভাস্কো-ডা-গামা নামক এক নাবিক ১৪৯৭ খ্রিস্টাব্দে এক অভিযানে বের হন। দিয়াজের পথ ধরে তিনি উত্তমাশা অন্তরীপ অতিক্রম করেন, তারপর তিনি আরও দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে পূর্ব আফ্রিকার কেনিয়ায় পৌছেন। এখানে এক আরব নাবিক তাঁকে ভারত মহাসাগর অতিক্রম করে ভারতে পৌছুতে সহায়তা করেন। ১৪৯৮ সালের মে মাসে ভাস্কো-ডা-গামা ভারতের কালিকটে পদার্পণ করেন এবং

ইউরোপ থেকে দূর প্রাচ্য পর্যন্ত পৌঁছার নতুন রাস্তা আবিষ্কারকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য একটি মার্বেল পাথরের স্মরণিকা তৈরি করেন। দুই বছর পর ডা-গামা পর্তুগালে ফেরত যান, কিন্তু ইতিমধ্যে তাঁর বহরের অর্ধেক জাহাজ হারিয়েছেন, লোকজনের তিনভাগের একভাগ মারা গেছে। কিন্তু অভিযানে অর্থ যত খরচ হয়েছিল তার ষাটগুণ বেশি অর্থ পাওয়া যায় জাহাজে করে ভারত থেকে আনা দারুচিনি ও মরিচ পর্তুগালের বাজারে বিক্রি করে। রাজ্য ম্যানুয়েল ভাস্কো-ডা গামার এ আবিষ্কারকে দ্রুত কাজে লাগালেন। ১৪০০ সালের পর থেকে পর্তুগিজ বাণিজ্য জাহাজ নিয়মিতভাবে ভারতে আসা যাওয়া শুরু করে। পর্তুগিজ ব্যবসায়ীদের সঙ্গে খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারকরাও সাথী হয়। ভারতের গোয়ায় প্রথম পর্তুগিজ মিশনারি আস্তানা গড়ে ওঠে। শীঘ্রই পর্তুগিজরা সিংহল, সুমাত্রা, জাভা এবং মশলার দ্বীপে তাদের বাণিজ্য কুঠি নির্মাণ করে। ১৪১৭ সালে তারা চীনের ক্যান্টনে উপস্থিত হয় এবং ১৫৪২ খ্রিস্টাব্দে জাপানে প্রবেশ করে।

স্পেনীয়দের আবিষ্কার

ডিয়াজের আবিষ্কারের পর পর্তুগিজরা এশিয়ায় যাওয়ার রাস্তা নিয়ন্ত্রণ করবে এটা ভেবে পর্তুগালের প্রতিদ্বন্দ্বী স্পেনীয়রা পশ্চিম থেকে অন্য রাস্তা বের করা যায় কি না তা নিয়ে চিন্তা শুরু করে। ইতালীয় জেনোয়ার অধিবাসী কলম্বাস এ ব্যাপারে এক পরিকল্পনা পেশ করেন। তাঁর ধারণা ছিল আটলান্টিকের ওপর পশ্চিমে নৌযান চালিয়ে গেলে তিনি ভারত এবং চীনে পৌঁছাতে পারবেন। তাঁর পরিকল্পনার জন্য তিনি পর্তুগালের রাজা দ্বিতীয় জনের আর্থিক সহায়তা চান। কিন্তু পর্তুগিজরা তখন আফ্রিকা অতিক্রম করে ভারতে পৌঁছার রাস্তা নিয়ে বিভোর ছিলো। কলম্বাস তখন স্পেনের রাজার নিকট সাহায্যের হাত বাড়ান। কাস্তিলের রাণী ইসাবেলা এবং তার স্বামী আরাগনের ফার্দিনান্দ এই সময় স্পেনের রাজতন্ত্রকে শক্তিশালী করে স্পেনে মুসলমানদের শক্ত অবস্থান গ্রানাডা থেকে বিতাড়নে ব্যস্ত ছিলেন। তারপরও তারা কলম্বাসের সহায়তায় এগিয়ে আসেন। ১৪৯২ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে স্পেনীয় বন্দর পালোস থেকে তিনটি ক্ষুদ্র জাহাজ, সাতাশি জন নাবিক এবং ক্যাথির রাজার জন্য একটি চিঠি নিয়ে রওয়ানা হন। সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে তিনি পশ্চিম দিকে যাচ্ছিলেন, এক সময় তার সঙ্গী নাবিকেরা বিরক্ত হয়ে বিদ্রোহ করে বসে, কিন্তু তবুও কলম্বাস তার পরিকল্পনা নিয়ে একাগ্র চিত্ত। অবশেষে ১২ অক্টোবর ১৪৯২ খ্রিস্টাব্দে কলম্বাসের জাহাজ মাটিতে নোঙর করল। তিনি কল্পনা করতে পারেননি তার আবিষ্কৃত স্থানটির নাম বাহামা, ভারত ও চীন থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে। তাঁর ধারণ ছিলো তিনি এশিয়ার উপকূলের কোথাও পৌঁছেছেন। এরপর তিনবার কলম্বাস তাঁর আবিষ্কৃত স্থানে, ব্যবসায়ী, ধর্ম প্রচারক ও উপনিবেশকারীদেরকে নিয়ে এসেছিলেন। স্বর্ণ, মশলা অথবা সিল্কের কোনো সন্ধান তারা পেলেন না। যে অদ্ভুত মানুষের সঙ্গে তিনি মিশেছেন আসলে তারা ছিল আদিম ক্যারিব, সুসভ্য ভারতীয় কিম্বা চীনা নয়। তারপরও কলম্বাস তাদেরকে ইন্ডিয়ান বা ভারতীয় বলতেন। আর এই ভাবে আমেরিকার আদিম অধিবাসীরা ইন্ডিয়ান নামে অভিহিত হতে থাকে।

সত্যি বলতে গেলে এটা বলা যাবে না যে কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করেছেন। কেননা বিশেষজ্ঞরা এখন একমত যে পশ্চিম গোলার্ধে ইউরোপীয়দের মধ্যে প্রথম পা রেখেছিল ভাইকিংরা। এক হাজার খ্রিস্টাব্দে তারা বর্তমান নিউফাউন্ডল্যান্ড, লব্রাডার এবং সম্ভবত নিউ ইংল্যান্ডে জাহাজ চালিয়ে পৌছেছিলেন। দ্বিতীয়ত কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করেন নি,

কারণ তিনি নিজেও জানতেন না তিনি কি আবিষ্কার করেছেন। এই ধারণা নিয়ে তিনি মারা যান যে তাঁর আবিষ্কৃত এলাকা এশিয়ার নিকটবর্তী অঞ্চল। কিন্তু এরপরও কলম্বাসের কৃতিত্ব কোনোভাবেই ম্লান হওয়ার নয়। আমেরিকায় ভাইকিংদের উপস্থিতি ইউরোপে শত শত বছর ধরে অবজ্ঞা বা ভুলে যাওয়া হয়েছে। আর কলম্বাস যদিও তাঁর আবিষ্কারের পরিচয় পান নি, কিন্তু শীঘ্রই তাঁর পথ ধরে অনেক নাবিক অভিযান করে বুঝতে পারেন তাঁর আবিষ্কার কি ছিলো। কলম্বাস এশিয়ার মশলা সাথে করে নিয়ে আসেননি বটে, কিন্তু সামান্য পরিমান স্বর্ণ এবং দু'একজন আদিম অধিবাসী ধরে এনেছিলেন। এগুলো প্রমাণ করে এলাকাটির ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারলে প্রচুর সম্পদের অধিকারী এবং দাস ব্যবসার একটা উৎস খুঁজে পাওয়া যাবে। ইসাবেলা এবং ফার্দিনান্দের সহায়তায় আরো কয়েকটি অভিযান পরিচালিত হয় ঐ সম্ভাবনাকে সামনে রেখে। শীঘ্রই আমেরিকার মূল ভূখন্ড এবং দ্বীপসমূহ আবিষ্কৃত হয়। যদিও কলম্বাস আমৃত্যু মানতে রাজি ছিলেন না। তারপরও ১৫০০ সাল নাগাদ সবার কাছে প্রতিভাত হয় যে একটা নতুন পৃথিবী আবিষ্কৃত হয়েছে। ১৫০৩ সালে আমেরিগো ভেসপুচি নামে এক ইতালীয় নাবিক একটি চিঠিতে দাবি করেন যে তিনি এক নতুন পৃথিবী আবিষ্কার করেছেন। আসলে তিনি ছিলেন মেডিসি ব্যাঙ্ক পরিবারের একজন এজেন্ট। স্পেন ও পর্তুগালে তিনি মাঝে মাঝে সল্প সময়ের জন্য থাকতেন। চার বছর পর এক জার্মান অধ্যাপক ভূগোল বিষয়ক এক নিবন্ধে প্রস্তাবনা করেন যে নতুন আবিষ্কৃত পৃথিবীর চতুর্থ ভাগকে আমেরিকা বলা উচিত, কেননা আমেরিগো এটা আবিষ্কার করেছেন। আর এই ভাবে আটলান্টিকের অপর পাড়ের ভূভাগ একজন মিথ্যা দাবিকারীর নাম অনুসারে আমেরিকা চিরস্থায়ী হয়ে পড়ে। ১৫০০ শতাব্দী নাগাদ নতুন বিশ্ব আবিষ্কৃত হওয়ায় স্পেনীয় শাসকরা যতটা খুশি হওয়ার কথা ততোটা হলেন না। তাঁরা নৌঅভিযানে প্রচুর বিনিয়োগ করেছেন। ইউরোপ আর এশিয়ার মধ্যবর্তী যদি একটা বিরাট ভূমির অবস্থান হয় তাহলে স্পেন তার শত্রুট পর্তুগালের সঙ্গে মশলার প্রতিযোগিতায় কিছুতেই পেরে উঠবে না। আর এদিকে যখন ১৫১০ সালে ভাস্কো নুয়েজি ডি বালবোয়া পানামা দ্বীপের (is this mus) দাঁড়িয়ে আবিষ্কার করলেন এবং দাবি করলেন যে ইউরোপ থেকে পূর্ব এশিয়ায় যেতে হলে একটা নয় বরং দু'দুটো মহাসাগর (আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগর) পাড়ি দিতে হবে। তখন তাদের মন আরো খারাপ হয়ে গেলো। ভাস্কো নুয়েজি ডে বালবোয়া (vasco Nuuez de Balboa) এরপরও ইসাবেলা ও ফার্দিনান্দের দৌহিত্র রাজা চার্লস ১৫১৯ খ্রিস্টাব্দে ম্যাগেল্লানকে (Magellan) নিয়োগ করেন যে দক্ষিণ আমেরিকা ঘুরে এশিয়ায় পৌছা যায় কিনা তা দেখার জন্য। ম্যাগেল্লান বিশ্বাস করতেন আফ্রিকার সর্ব দক্ষিণ বিন্দুটি ডিয়াজ এবং ডা গামা যেমন অতিক্রম করতে পেরেছিলেন তিনিও তেমনি দক্ষিণ আমেরিকার কেন্দ্রটি ঘুরতে পারবেন। ১৫১৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি আটলান্টিক অতিক্রম করেন, পরে দক্ষিণ আমেরিকা ঘুরে তার নাম বহনকারী প্রণালী অতিক্রম করেন। তারপর তিনি তিয়েরা ডেল ফুয়ে গো (Tierra de Fuego) থেকে প্রশান্ত মহাসাগর অতিক্রম করে নব্বই দিন পর প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপ গুয়ামে উপস্থিত হন। সেখান থেকে আরো সাতদিনের অভিযান চালিয়ে তার নাম দেয়া দ্বীপপুঞ্জ সেন্ট লাজরাসে (St. Lazrus) উপস্থিত হন। এই দ্বীপপুঞ্জের পরবর্তী নাম হয় ফিলিপাইন। ম্যাগেল্লান (Magellan) স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হন। কিন্তু তাঁর একটি জাহাজ পর্তুগিজদের আবিষ্কৃত রাস্তায় ভারত মহাসাগর এবং উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে ১৫২২ খ্রিস্টাব্দে স্পেনে পৌঁছে। এই প্রথম জাহাজে করে পৃথিবী পরিক্রমার ঘটে।

মধ্য আমেরিকা ও কনকুইসটাডোর অভিযানকারী (conquistadores)

যদিও স্পেনীয়দের চোখে এশিয়ায় পৌঁছার জন্য আমেরিকা ছিল একটি প্রতিবন্ধক, ক্রমেই তারা বুঝতে পারল নতুন বিশ্ব সম্পদে পরিপূর্ণ। কলম্বাস সামান্য কিছু স্বর্ণ নিয়ে এসেছিলেন, এর সঙ্গে গুজবের সংমিশ্রণে স্পেনে একটা ধারণা জন্মে যে সেখানে প্রচুর স্বর্ণ আছে। কিছু দুঃসাহসী স্পেনীয় ব্যক্তিগত উদ্যোগে স্বর্ণের লোভে অভিযান শুরু করে এবং ছলেবলে কল্পনার অতীত স্বর্ণ হস্তগত করে। ১৫১৯ থেকে ১৫২১ সালে পর্যন্ত হারনাদো কর্তেজ (Hernado Cortes) নামক একজন কনকুইস্তাদোর (স্পেনীয় ভাষায় Conquistadores মানে অভিযানকারী) ছয়শত লোক, সাতটা কামান এবং তেরটি ঘোড়া নিয়ে আজতেক সাম্রাজ্য মেক্সিকো আক্রমণ করে। আজটেকরা কামান বা ঘোড়া ইতিপূর্বে দেখে নি। ঘোড়া দেখে তারা ভয় পেয়ে যায়। তারা মনে করেছিল ঘোড়ার চালক এবং ঘোড়া এক সঙ্গে এক অদ্ভুত জন্তু। এক মিলিয়ন আজটেক খুব সহজে পরাজিত হয় এবং কর্তেজ তাদের জমানো সমস্ত সম্পদ লুণ্ঠন করে নিয়ে যায়। ১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দে আরেক কনকুইসটাডোর ফ্রান্সিসকো পিজারো (Francisco Pizarro) মাত্র একশত আশি জন যোদ্ধা দিয়ে ইনকাদের সাম্রাজ্য আক্রমণ করে পেরু অধিকার করে নেয়। বন্দী ইনকা-রাজা স্পেনীয়দেরকে তাদের চাহিদা মতো স্বর্ণ দিতে রাজি হয়। স্বর্ণ নেওয়ার পর তারা রাজাকে হত্যা করে এবং আরো স্বর্ণ পাওয়ার জন্য ইনকাদেরকে দাস বানাতে শুরু করে। এই দুই কনকুইস্তাদোর শুধুমাত্র কামান ও ঘোাড়ার কারণে জয়ী হয় নি, তাদের সাহস, বিশ্বাসঘাতকতা ও নৃশংসতা তাদেরকে জয় এনে দিয়েছিলো। এবং এর আগে এত অল্প লোক এতো বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে এতো বিশাল এলাকা দখল করে নি এবং এতো নৃশংসতা ও বর্বরতাও প্রদর্শন করে নি।

কর্তেজ, পিজারো ও অন্যান্য কনকুইস্তাদোরগণ তাদের নিজেদের স্বার্থে অভিযান চালিয়েছিলো, স্পেনের জন্য নয়। তারা জানত কি করে লুণ্ঠন করতে হয়, উৎপাদন করে সম্পদ আহরণ করা তারা জানত না। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্য ভাগে স্পেনের রাজা মধ্য এবং দক্ষিণ আমেরিকার (ব্রাজিল বাদে, ওটা ছিল পর্তুগিজদের উপনিবেশ) উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে মূল্যবান ধাতব দ্রব্য লুণ্ঠন নয় বরং খনি থেকে উত্তোলন করে তা তারা স্পেনে পাচার করতে শুরু করে। স্বর্ণ যদিও সবার আরাধ্য ছিল, কিন্তু স্পেনীয়রা এর সন্ধান কমই পেয়েছে। স্থানীয় সভ্যতার আমলে স্বর্ণ প্রচুর উত্তোলিত হয়েছিল। শীঘ্রই স্পেনীয়রা বুঝতে পারলো বলিভিয়া এবং মেক্সিকো এলাকায় তারা পৃথিবীর সর্ববৃহৎ রোপ্য খনির উপর বসে আছে। আরো জোর করে শ্রম আদায় এবং পূর্বের তুলনায় উন্নততর প্রযুক্তি ব্যবহার করে তারা এত রোপ্য উত্তোলন করেছিল যে স্বর্ণ না পাওয়ার শোক তারা ভুলতে পেরেছিলো। গো-মহিষের এবং ইক্ষুর খামার প্রতিষ্ঠা করেও তারা প্রচুর লাভবান হয়।

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্য ভাগ সময়ে ইউরোপীয়রা পৃথিবীর আকার, প্রকৃতি, সমুদ্র, বড় বড় মহাদেশ গুলোর অবস্থান এবং আফ্রিকা ও আমেরিকায় যাওয়ার দুটো রাস্তা ইত্যাদি সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করে। ইউরোপীয় বাণিজ্যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এলো। ভূমধ্যসাগরের পরিবর্তে আটলান্টিক এখন পশ্চিমা দেশগুলোর অর্ন্তদেশীয় সমুদ্রে পরিণত হলো।

সারসংক্ষেপ

ভারত ও চীনের মশলা, স্বর্ণ, সিল্ক ইত্যাদির সন্ধানে ইউরোপীয়দের ভৌগোলিক অভিযান শুরু হয়। অসংখ্য নাবিক প্রচন্ড ধৈর্য, সাহস, বুদ্ধি এবং মৃত্যু ভয়কে উপেক্ষা করে মহাসমুদ্রের নৌকায় পাল তুলেছে। দিয়াজ, ভাস্কো দা গামা, কলম্বাস, ম্যাজেল্লান প্রমুখ নাবিকদের প্রচেষ্টায় শুধু এশিয়ায় আসার পথই আবিষ্কৃত হয় নি, ইউরোপ নতুন এক বিশ্বের সন্ধান লাভ করেছে। এখানকার সম্পদ ও কর্তৃত্ব ক্রমেই ইউরোপকে সারা পৃথিবীর নিয়ন্ত্রকের আসনে বসিয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। উত্তমাশা অন্তরীপ আবিষ্কার করেন
(ক) হেনরি নেভিগেটর (খ) কর্তেজ
(গ) কলম্বাস (ঘ) দিয়াজ

২। ভাস্কো দা গামা কালিকটে পৌঁছান
(ক) ১৪৯৮ সালে (খ) ১৫৯৮ সালে
(গ) ১৬৯৮ সালে (ঘ) ১৭৯৮ সালে

৩। স্পেনীয়রা উৎসাহী ছিল
(ক) আমেরিকায় পৌঁছানোর জন্য (খ) জাপানে পৌঁছানোর জন্য
(গ) ভারতে পৌঁছানোর জন্য (ঘ) ল্যাটিন আমেরিকায় পৌঁছানোর জন্য।

৪। কলম্বাস ''ইন্ডিয়ান'' নাম দিয়েছিলেন
(ক) আমেরিকার আদি অধিবাসীদের (খ) ভারতীয়দের
(গ) চীনাদের (ঘ) আরবদের

রচনামূলক প্রশ্ন

১। কলম্বাস কী ভাবে আমেরিকা আবিষ্কার করেন
২। আমেরিকা আবিষ্কার কীভাবে স্পেনীয়দেরকে ভারতে না পৌঁছানোর দুঃখ ভুলিয়ে দিয়েছিলো

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর

১। (ঘ), ২। (ক), ৩। (গ), ৪। (ক)।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। ভৌগোলিক আবিষ্কারে ম্যাগগিলানের অবদান মূল্যায়ন করুন।
২। কনকুইস্তাদোরগণ কিভাবে সম্পদশালী হয়েছিলেন বর্ণনা করুন।

পাঠ - ৩

ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলাফল

এই পাঠ শেষে আপনি -

- ইউরোপ বিভাবে ভৌগোলিক আবিষ্কারের দ্বারা অর্থনৈতিক ভাবে লাভবান হতে থাকে তা জানতে পারবেন;
- ভৌগোলিক আবিষ্কার কিভাবে নতুন করে দাস ব্যবসার প্রচলন শুরু করল তা জানতে পারবেন;
- ভৌগোলিক আবিষ্কার কীভাবে বিশ্বব্যাপী ঔপনিবেশবাদের সূচনা করে তা জানতে পারবেন;
- বাণিজ্যবাদ কি জানতে পারবেন;
- কীভাবে ব্যাঙ্ক, বীমা ও জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানির শুরু তা জানতে পারবেন;
- ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলে ইউরোপের একাকীকত্বের পরিসমাপ্তি ঘটল। সমুদ্রপথে ইউরোপের সঙ্গে দূরপ্রাচ্য এবং আমেরিকার সঙ্গে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হলো। অর্থনৈতিক ও ব্যবসায়িক যে পরিবর্তন ইউরোপ প্রত্যক্ষ করলো তাকে ঐতিহাসিকেরা বলেছেন "বাণিজ্যিক বিপ্লব"।

বাণিজ্যিক কেন্দ্রের পরিবর্তন

ভৌগোলিক আবিষ্কারের পূর্বে-ইউরোপের সামুদ্রিক বাণিজ্য ছিল ভুমধ্যসাগর কেন্দ্রিক। এখন তা পরিবর্তিত হয়ে আটলান্টিক মহাসাগরীয় অঞ্চলকেন্দ্রিক হয়ে উঠে। এটি গড়ে ওঠে নতুন নতুন ব্যবসার প্রাণকেন্দ্র হিসাবে। ইতালীয় শহর ভেনিস ও জেনোয়া দূরপ্রাচ্যের সঙ্গে বাণিজ্যে তার পূর্ব প্রাধান্য বজায় রাখতে পারলো না দুটো কারণে। **প্রথমত:** তূর্কি মুসলমানদের কর্তৃত্বে ভূমধ্যসাগরের পথ মুসলমানদের অধীনে আসলে দূরপ্রাচ্যের সঙ্গে ভেনিস ও জেনোয়ার যোগাযোগ প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। **দ্বিতীয়ত:** পর্তুগিজ এবং স্পেনীয়দের আবিষ্কত উত্তমাশা অন্তরীপ হয়ে ভারতে পৌছার রাস্তা আবিষ্কৃত হওয়ায় ইতালীয় শহরগুলো তীব্র প্রতিযোগিতার মুখে পড়ে। এখন অন্যান্য ইউরোপীয় বণিকরা ভেনিস ও জেনোয়ায় না গিয়ে পণ্যের জন্য লিসবন ও সেভিলে যেতে শুরু করল। অবশ্য পর্তুগাল ও স্পেনের বাণিজ্যিক প্রাধান্য বেশি দিন রইল না, ক্রমেই হল্যান্ড ও ফ্রান্স ইউরোপীয় বাণিজ্যে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করল।

খ) নতুন নতুন পণ্য ও শস্যের প্রচলন

মশলা আর সিল্ক আনার প্রয়োজনে ইউরোপ যখন ভারতে আসার পথ খুজঁতে শুরু করে তখন ভৌগোলিক আবিষ্কারের শুরু। দুর্ঘটনাক্রমে তারা ভারতে না এসে আমেরিকায় পৌঁছে যায়। কালক্রমে ইউরোপের কাছে আমেরিকার আবিষ্কার এশিয়ায় আসার পথ থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও সূদূরপ্রসারী হয়ে ওঠে। আমেরিকায় এমন কিছু কৃষিজপণ্য ছিল যা কোনো দিন ইউরোপ দেখে নি। যেমন তামাক, ভুট্টা, টমেটো, গোলআলু, বাদাম, রাবার ইত্যাদি। ইউরোপে গরিব মানুষের খাবার হিসেবে আলু ও ভূট্টা খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠে। ইউরোপীয়রা

এক ধরনের খেলার বল দেখলো যা মাটিতে পড়ে লাফিয়ে ওঠে। ইউরোপীয়দের খেলার বল ছিল কাঠ ও চামড়ার তৈরি। আমেরিকান বলগুলো ছিল রাবারের তৈরি। রাবার ইউরোপীয়দের নিকট ছিল অজানা। অবশ্য ইউরোপীয়রা এই আবিষ্কারকে কাজে লাগাতে পারল তিনশত বছর পর। অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীতে ওয়াটার প্রুফ কাপড় ও জুতো বানাতে তারা ব্যাপক হারে রাবার ব্যবহার শুরু করল। ইউরোপীয়রা তাদের দেশ থেকে নিয়ে আমেরিকায় ঘোড়া, গাধা, শুকর, ভেড়া, হাঁসমুরগী, লেবু, কমলা, কলা, জলপাই ইক্ষু ইত্যাদির প্রচলন করে। আমেরিকায়এগুলো এক সময় অতিরিক্ত উৎপাদন হয়ে ইউরোপে রফতানি হতে থাকে।

দূরপাচ্য থেকে আনা মশলা ও সিল্ক আগে ইউরোপীয় ধনীরাই ব্যবহার করত। কিন্তু সস্তা হওয়ায় অনেকে এসব ব্যবহার শুরু করল। ভারত থেকে উন্নত মানের কাপড়ও ইউরোপে আসতে শুরু করল, আর ইউরোপীয়দের পরিধেয় পোশাক পূর্বের তুলনায় লম্বা ও বিস্তৃত হওয়া শুরু করলো। পূর্বাঞ্চল থেকে নানা সুগন্ধী ইউরোপে প্রবেশ করলো। এসব সুগন্ধী ইউরোপীয়রা তাদের কাপড়ে, শরীরে, চুলে মাখত যেন শরীরের দুর্গন্ধ দূর হয়। কেননা ইউরোপীয় অভিজাতরাও মাসে একবার বা দুবারের বেশি গোসল করত না। বাণিজ্যে বড় বড় জাহাজ ব্যবহারের প্রচলন শুরু হলে জাহাজে প্রচুর জায়গা প্রায়ই খালি থাকত। প্রচলিত পণ্য-সামগ্রী ছাড়াও এসব জায়গা পরিপূর্ণ করে তারা অনেক নতুন নতুন জিনিস ইউরোপে নিয়ে এলো। চীন থেকে চা, পূর্ব আফ্রিকা থেকে কফি ইত্যাদি।

গ) উপনিবেশ স্থাপন

ভৌগোলিক আবিষ্কার বিশ্বব্যাপী ইউরোপীয় উপনিবেশ স্থাপনের সূচনা করে। ইউরোপীয় অভিযানের মুখে গোত্রে গোত্রে বিভক্ত আমেরিকার স্থানীয় অধিবাসীরা একত্রিত হতে পারলোনা। তাদের অস্ত্রশস্ত্র-ও ইউরোপীয়দের তুলনায় ছিল অনুন্নত এবং অতি পুরাতন। ফলে ইউরোপীরা তাদেরকে পরাভূত করে সহজেই তাদের জায়গা দখল করে নেয়। ইউরোপীয় আধিপত্যের জন্য আমেরিকার জনগণকে অপরিসীম মূল্য দিতে হয়েছে। যদিও সঠিক হিসাব পাওয়া কঠিন তবুও হিসপানিওলা দ্বীপে ১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দে স্থানীয় জনগণের আনুমানিক সংখ্যা ছিল ২৫০,০০০ জন, তা কয়েকবছর পর ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দে দাঁড়ায় মাত্র-৫০০তে। স্পেনীয় শাসনের একশ বছরে মেক্সিকোর জনসংখ্যা ২০ শতাংশ কমে যায়। অবশ্য ইউরোপীয়দের কঠোর দমন নীতিই জনসংখ্যা কমে যাবার একমাত্র কারণ নয়। ইউরোপীয়রা অনেক নতুন রোগ যেমন, গুটিবসন্ত, হাম ইত্যাদির জীবাণু আমেরিকায় নিয়ে আসে যা স্থানীয় লোকদের পক্ষে প্রতিরোধ করা সম্ভব হয় নি। মহামারী আকারে এই সব রোগ অসংখ্য মানুষের জীবন কেড়ে নেয়। কিন্তু অসংখ্য নিরপরাধ লোকের জীবন প্রদীপ নিভে গেছে দখলদারদের নির্দয় শোষণের কারণে। শ্রমিকদের এত কঠোর পরিশ্রম করতে তারা বাধ্য করেছে যে অনেকে ক্লান্তিতে এবং যত্নের অভাবে মারা গেছে। ওয়েষ্ট ইন্ডিজের ক্যারিবীয়দেরকে স্পেনীয় উপনিবেশকারীরা এত নৃশংসভাবে শোষণ করে যে পুরো জাতি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এশিয়ায় উপনিবেশ স্থাপন করতে এসে ভিন্ন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হয় এশিয়ার শাসকরা শক্তিশালী ছিলেন, তাদের সেনাবাহিনী সুসংগঠিত ও উন্নততর অস্ত্রশস্ত্রে র অধিকারী। তাই এখানে ইউরোপীয়রা আমেরিকানদের যেভাবে সরাসরি যুদ্ধ করে পরাজিত করেছিল সেভাবে এশিয়োদের পরাজিত করার আশা করে নি। এশিয়ায় প্রথমে তারা বাণিজ্যের নামে ঘাটি স্থাপন করে। যখন ক্রমান্বয়ে নিজেদেরকে তারা শক্তিশালী বোধ করতে শুরু করল তখন তারা আস্তে

আস্তে বিভিন্ন এলাকা দখল করলো। কখনো কখনো তারা ককোন স্থানীয় শাসকের সঙ্গে এই মর্মে চুক্তি করলো যে ইউরোপীয়রা ঐ শাসককে তার শত্রুটর বিরুদ্ধে সাহায্য করবে, বিনিময়ে তাদেরকে কিছু জায়গা ছেড়ে দেবে।

উপনিবেশ স্থাপন করতে গিয়ে পশ্চিম ইউরোপীয় দেশ পর্তুগাল, স্পেন, নেদারল্যান্ডস, ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। উপনিবেশ নিয়ে ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড কয়েক শতাব্দী ধরে শত্রুতা এবং রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত হয়।

ঘ) দাস ব্যবসা

ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপে দাস প্রথা চালু না থাকলেও পর্তুগিজরা এবং স্পেনীয়রা যখন আফ্রিকায় এবং এশিয়ায় যায় তখন তারা দেখতে পায় ঐ সমস্ত সমাজে দাস প্রথার বেশ প্রচলন রয়েছে। আমেরিকায় পর্তুগীজ এবং স্পেনীয় উপনিবেশকারীদের সংখ্যা ছিলো কম, তাছাড়া বিস্তৃর্ণ এলাকায় তারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। বন-জঙ্গল পরিষ্কার করে বিশাল পাহাড় ডিঙ্গিয়ে রাস্তাঘাট, ইমারত নির্মাণ, মাটি খুঁড়ে স্বর্ণ রোপ্য উত্তোলন ইত্যাদির জন্য তাদের আমেরিকার আবহাওয়ায় কাজ করার উপযোগী প্রচুর সস্তা শ্রমিকের প্রয়োজন ছিল। এই ভাবে ক্রীতদাস প্রথায় তারা জড়িয়ে পড়ে, আর ওয়েষ্ট ইন্ডিজ, মেক্সিকো, পেরু এবং ব্রাজিলের জনগণকে ধরে তারা দাস বানিয়ে কঠোর পরিশ্রমে বাধ্য করতে থাকে। এক সময় খ্রিস্টান মিশনারীদের চাপে এবং মানবতাবাদীদের চেষ্টায় আমেরিকান ইন্ডিয়ানদেরকে দাস বানানোর প্রচেষ্টা বন্ধ হয়। ১৫১৭ খ্রিস্টাব্দে বিখ্যাত মিশনারি বিশপ Bartolome de las Casas অনুরোধে স্পেনের রাজা আফ্রিকা থেকে দাসদেরকে আমেরিকায় আনতে শুরু করেন। তাঁর যুক্তি ছিল আমেরিকান ইন্ডিয়ানদের তুলনায় আফ্রিকানরা শ্রমের জন্য অনেক বেশি উপযুক্ত। পর্তুগিজদের কর্তৃত্বে আফ্রিকান ক্রীতদাসদেরকে আমেরিকায় পাঠানোর পেছনে সস্তায় শ্রম পাওয়া ছাড়াও তারা এদেরকে খ্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষা দিতে পারবে এমন একটি কারণও কাজ করেছিলো। ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনের রাজা তার অধীনস্থ নেদারল্যান্ডের একজনকে বছরে ৪,০০০ নিগ্রোকে ওয়েষ্ট ইন্ডিজে প্রেরণ করার একটি অনুমতি পত্র প্রদান করেন। ঐ ব্যক্তি পরে ঐ অনুমতিপত্র জেনোয়ার এক ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রি করে দেন। ব্যবসায়ীরা পর্তুগিজদের থেকে দাস কিনে নিয়ে আমেরিকায় পাঠাতো। এইভাবে পর্তুগিজদের অধীন আফ্রিকান এলাকা থেকে স্পেনীয় কর্তৃত্বাধীন আমেরিকায় দাস পাঠানোর ব্যবসা নিয়মিত ভাবে শুরু হয়।

আমেরিকায় বড়ো খামারের সংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে দাস ব্যবসার পরিমানও বাড়তে থাকে। এক হিসাব মতে অষ্টাদশ শতাব্দীতে বছরে গড়ে ৭৫,০০০ থেকে ৯০,০০০ হাজার দাসকে আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে আমেরিকায় নেয়া হয়েছিলো। ব্যবসায়ীরা সাধারণত: কাপড়, ধাতব দ্রব্য, বন্দুক ইত্যাদির বিনিময়ে দাসদেরকে কিনে নিতো।

ঙ) বাণিজ্যবাদ

ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলে ইউরোপের রাষ্ট্রনীতিতে এক অর্থনৈতিক মতবাদের প্রভাব সূচিত হলো। বাণিক বাদ বা মার্কেন্টালিজম নামের এই মতবাদের মানে হলো সরকার রাষ্ট্রের স্বার্থে অর্থনীতিকে বিশেষ করে ব্যবসা ও শিক্ষাকে এমন ভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে যেন দেশ

স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করতে পারে। ভৌগোলিক আবিষ্কার ইউরোপীয় দেশগুলোর সামনে সীমাহীন সম্পদের দ্বার খুলে দিলো, প্রত্যেক রাজা চাইলেন তার দেশ ও জনগণ এ সুযোগ থেকে কতটা লাভবান হতে পারে। মতবাদটি নতুন কোনো মতবাদ নয়। ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বে নগর সরকার তার নাগরিকদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণ এবং তত্ত্বধান করত, ব্যবসায়ীদের গিল্ড এবং কারিগরদের গিল্ডের মাধ্যমেএই নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা হতো। কিন্তু ষোড়শ শতকের মার্কেন্টা লিজমের প্রভাবে এর বিস্তৃতি শহর থেকে রাষ্ট্র সরকারের হাতে চলে যায়, স্থানীয় গিল্ডের পরিবর্তে রাজা এখন অর্থনৈতিক কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে। যেমন পর্তুগালের রাজা দূর প্রাচ্যের ব্যবসার একচ্ছত্র আধিপত্য বা মনোপলি কায়েম করেন লিসবনের উপকারের জন্য নয়, বরং পুরো পর্তুগিজ জাতির উন্নতি এবং সমৃদ্ধির জন্য। অন্যান্য রাজাদের একই রকম উদ্দেশ্য ছিল, তারাও চাইছিলেন তাদের নাবিকরা এবং ব্যবসায়ীরা পর্তুগিজ এবং স্পেনীয়দের মনোপলি ভেঙ্গে দেশের জন্য প্রচুর সম্পদের ব্যবস্থা করুক।

বণিকবাদের কতগুলি বৈশিষ্ট্য ছিল। **প্রথমত:** এই মতবাদ মূল্যবান ধাতব পদার্থ জমা রাখার উপর বিশেষ জোর দিতো। মনে করা হতো একটা দেশের যত বেশি স্বর্ণ ও রৌপ্য থাকবে দেশটি তত বেশি শক্তিশালী হবে। **দ্বিতীয়ত:** কোনো দেশ যদি মূল্যবান ধাতব দ্রব্যের অধিকারী না হয় বাণিজ্যের মাধ্যমে তা তাদেরকে সংগ্রহ করতে হবে। ঐ দেশকে আমদানির তুলনায় প্রচুর রফতানি করতে হবে যাতে করে বিদেশীরা স্বর্ণ রাজ্যের মাধ্যমে তা পরিশোধ করে। আমদানি করা হবে শুধু মাত্র এমন দ্রব্য যা দেশে উৎপন্ন হয় না, আমদানির পর ঐ গুলোকে পণ্যে রুপান্তরিত করে আবার রফতানী করা হবে। **তৃতীয়ত:** প্রত্যেক দেশ কাঁচামালের ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া উচিত, তা না হলে তাকে উপনিবেশ স্থাপনের দিকে যাওয়া উচিত যেন প্রতিদ্বন্দ্বি দেশের তুলনায় ঐ দেশ মূল্যের দিক থেকে সুবিধাজনক ভাবে অবস্থান করে। উপনিবেশ থাকার আরো একটা লাভ হলো ঐগুলো প্রস্তুত দ্রব্যের অবাধ বাজার হবে। **চতুর্থত:** উপনিবেশগুলিকে নিরাপত্তা দিতে হবে, প্রয়োজনে শক্তিশালী নৌবহর গঠন করে বিদেশীদের যাতে বাজার বা কাঁচামালের উৎস বানাতে না পারে তার জন্য বাঁধা দিতে হবে। উপনিবেশ গুলোতে এমন উৎপাদনে যাওয়া উচিত হবে না যাতে করে মূলদেশের কারখানা বা বাজার ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

মার্কেন্টাইলজিমের প্রভাবে ইংল্যান্ড তার কাঁচা উল রফতানি বন্ধ করে দিয়েছিলো যেন ইংল্যান্ডের নিজস্ব উল শিল্প বিকশিত হয়। স্পেন ও পর্তুগাল তাদের সাম্রাজ্যে বিদেশী বণিকদের প্রবেশ বা বাণিজ্য নিষেধ করার চেষ্টা করেছিলো।

ভৌগোলিক আবিষ্কার এবং বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যের প্রসারের ফলে বাণিজ্যিক সহায়তাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের যেমন ব্যাংক, জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানি, ইন্স্যুরেন্স ইত্যাদির বিকাশ ঘটে। ব্যাংকের অস্তিত্ব মধ্যযুগেও থাকলেও গির্জা সুদকে ঘৃণা করায় এ ব্যবসাটা মূলত: ইহুদীদের হাতে ছিল। কিন্তু মধ্যযুগের শেষের দিকে ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তার লাভ করায় খ্রিস্টানদের মধ্যে ব্যাংক ব্যবসা চালু হয়। তবে তাদের মধ্যে প্রথম ব্যাংক গড়ে উঠে পারিবারিক পর্যায়ে। চর্তুদশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে ফ্লোরেন্সের মেডিসি পরিবার এবং জার্মানির অগমবার্গের ফাগার পরিবার উল্লেখযোগ্য ব্যাংকার হিসাবে আর্বিভূত হয়। পরে ইউরোপের বিভিন্ন শহরে আরো ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হলো। এখন হল্যান্ডের শহর এ্যামষ্টারডামের একজন ব্যবসায়ী ব্যাংক অব

এ্যামষ্টারডামের টাকা জমা দিয়ে Bill of Exchange ইস্যু করিয়ে নিলো। পরে সে ভেনিসের ব্যবসায়ী থেকে মালামাল ক্রয় করল। ভেনিসের ব্যবসায়ী Bill of Exchange নিজস্ব ব্যাংকে জমা দিয়ে তার প্রাপ্য টাকা উঠিয়ে নিতে পারল। ব্যাংক দুটি পরে নিজেদের মধ্যে সহযোগিতার মাধ্যমে তাদের লেনদেন মিটিয়ে নিলো। প্রথমে এই ব্যবস্থা ইতালিতে শুরু হয় এবং তা ক্রমে অন্য দেশে ছড়িয়ে পড়ল।

আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্যের বিস্তৃতি ঘটায় আমেরিকা থেকে আগত মূল্যবান ধাতুর সরবরাহ ইউরোপে বেড়ে যায়। কিন্তু তারপরও চাহিদা সরবরাহের সঙ্গে তাল মিলাতে পারছিলো না। ফলে ব্যাংকগুলো চেক (Cheque) ব্যবস্থার প্রবর্তন করল। ব্যাংকের জমা অর্থের বিপরীতে একজন ব্যবসায়ী চেক ইস্যু করতে পারতো। অন্য ব্যবসায়ী টাকার মতো মূল্য দিয়ে তা গ্রহণ করে লেনদেন করত। এ ব্যবস্থা চালু হওয়ায় নগদ অর্থ লেনদেনের পরিবর্তে চেক ব্যবস্থায় বাণিজ্য প্রসারিত হলো।

দূরদেশে ব্যবসায়-বাণিজ্য চালিয়ে যেতে প্রয়োজন পড়ল প্রচুর পুঁজি, যা একজন ব্যবসায়ীর পক্ষে প্রায়ই জোগাড় করা সম্ভব হতো না। এখন আবির্ভূত হলো জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানি। এর মাধ্যমে অসংখ্য লোকের কাছ থেকে ক্ষুদ্র টাকার শেয়ারের মাধ্যমে বিশাল পুঁজি সংগৃহীত হওয়া শুরু হলো। যারা কোম্পানির শেয়ার কিনতো তারা কোম্পানির কাজে অংশ গ্রহণ করতো, অথবা করতো না। কেউ না করলেও সে ব্যবসার যৌথমালিক এবং বিনিয়োগকৃত শেয়ারের অনুপাতে লভ্যাংশ ভোগ করতো। কোন মালিক তার শেয়ার পণ্য দ্রব্যের মতো হস্তান্তর করার অধিকারী ছিল।

বীমার ব্যবহারও ব্যবসা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো। সাধারণত: বীমার স্থিতিকাল ছিল নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। যেমন একটি জাহাজ সাফল্যজনকভাবে গন্তব্যে পৌঁছার সময়কাল ব্যাপী। জাহাজ ছাড়া মালামাল, জীবন ইত্যাদির উপরও ক্রমেই বীমার প্রচলন শুরু হয়।

সারসংক্ষেপ

ভৌগোলিক আবিষ্কার যে বাণিজ্য বিপ্লব বয়ে আনলো তার ফলাফল বিশ্বের জন্য ছিল সুদুরপ্রসারী। ইউরোপে বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপিত হলে, নতুন বাণিজ্যে শহর বিকশিত হলো, ব্যবসায়ে সহায়তাকারী কতগুলি প্রতিষ্ঠান যেমন ব্যাংক, জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানি, বীমার আবির্ভাব ঘটলো, বিভিন্ন দেশ থেকে নতুন পণ্য ইউরোপে প্রবেশ করায় ইউরোপীয়দের প্রচুর লাভ ও জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য বেড়ে গেলো। কিন্তু ভৌগোলিক আবিষ্কার এশিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকার জনগণের জন্য অন্ধকারাচ্ছন্ন ভবিষৎ নিয়ে এলো। ক্ষমতাধর ইউরোপীয়রা এসব এলাকার অনুন্নত জনগণের শুধু ভূমিই আত্মসাৎ করলো না, বরং তাদেরকে দাস বানিয়ে দেশান্তরীত করে তারা তাদের মুনাফার পরিমান আরো বাড়িয়ে তুলেছিলো।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। বাণিজ্যিক পথ পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিগ্রস্থ হলো -
(ক) ভূমধ্যসাগরীয় এলাকাগুলো (খ) আটলান্টিক মহাসাগরীয় এলাকাগুলো
(গ) প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকাগুলো (ঘ) ভারত মহাসাগরীয় এলাকাগুলো।

২। রাবার আবিষ্কারের পর ইউরোপীয়রা তা ব্যাপকভাবে ব্যবহার শুরু করে -
(ক) সপ্তদশ শতাব্দীতে (খ) অষ্টাদশ শতাব্দীতে
(গ) উনবিংশ শতাব্দীতে (ঘ) বিংশ শতাব্দীতে

৩। ইউরোপীয়রা যে দুটি রোগ আমেরিকায় নিয়ে যায় তা হলো -
(ক) গুটিবসন্ত ও হাম (খ) কলেরা ও জল বসন্ত
(গ) টাইফয়েড ও ইনফ্লুয়েঞ্জা (ঘ) আমশা ও উদরাময়।

৪। ইউরোপীয়রা কোন এলাকার জনগণকে সহজে পরাজিত করতে পারে নাই -
(ক) আমেরিকা (খ) আফ্রিকা
(গ) অষ্ট্রেলিয়া (ঘ) এশিয়া।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। বণিকবাদ বা মার্কেন্টালিজম সম্পর্কে আলোচনা করুন
২। ভৌগোলিক আবিষ্কার কীভাবে ব্যাঙ্ক, জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানি বিকাশে সহায়তা করেছে তা আলোচনা করুন।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর

১। (ক), ২। (গ), ৩। (ক), ৪। (খ)।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। দূরপ্রাচ্যের সঙ্গে ব্যবসায়িক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ইউরোপ কীভাবে লাভবান হয়েছিলো?
২। ইউরোপীয় আধিপত্যে আমেরিকা ও আফ্রিকার জনগণের উপর কী ধরনের প্রভাব বিস্তার করে ছিলো?

পাঠ - ৪

কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে অগ্রগতি

এই পাঠ শেষে আপনি -

- ভৌগোলিক আবিষ্কার কীভাবে ইউরোপীয় কৃষি ও শিল্পকে প্রভাবিত করে সে সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- কৃষিতে কী করে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সূত্রপাত হলো এবং জমিতে বেষ্টনী প্রথা একটি আন্দোলন হিসেবে দাঁড়ালো সে সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা পাবেন;
- প্রাচীন গিল্ড ব্যবস্থা ভেঙ্গে কীভাবে শিল্পে উৎপাদন ব্যবস্থায় নতুন পরিবর্তন এলো সে সম্পর্কে জানতে পারবেন।

ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলে যে বাণিজ্য বিপ্লব সংগঠিত হল তার ব্যাপক প্রভাব পড়ল তৎকালীন উৎপাদন ব্যবস্থায়। ইউরোপ এখন নিজের জন্যই নয় বরং পুরো বিশ্বের জন্য উৎপাদন করতে লাগল। বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের কাঁচামাল ইউরোপের বাজারে প্রবেশ করল। এই প্রেক্ষাপটে সনাতনী কৃষি ও শিল্প ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তন দেখা দিলো।

ক) পুঁজিবাদী কৃষিব্যবস্থার জন্ম

কৃষিব্যবস্থাপনা এক ধরনের পুঁজিবাদী নীতি দ্বারা পরিচালিত হওয়া শুরু করলো। ইউরোপে স্বয়ংসম্পূর্ণ কৃষি ব্যবস্থার পরিবর্তে বাজার উপযোগী কৃষি ব্যবস্থার বিকাশের সূচনা হলো। সহজে পুঁজিবাদ বলতে এমন এক প্রক্রিয়া বুঝানো হয় যেখানে উৎপাদন, বন্টন এবং বিনিময়ে সঞ্চিত সম্পদের ব্যবহারের মাধ্যমে মালিকের সবার্ধিক লাভ থাকে। মধ্যযুগীয় ম্যানর প্রথায় উৎপাদন ছিল ম্যানরের লোকজনের প্রয়োজন অনুযায়ী। ওদের চাহিদার সবটুকু খাদ্যশষ্য, কাপড়-চোপড়, তৈজসপত্র ইত্যাদি ম্যানরেই উৎপাদিত হতো। যা কিছু উৎপাদন করা হতো তার সবটুকু ব্যবহার করা হতো। উদ্বৃত্ত বিক্রি বা জমা করে ভবিষতে কাজে লাগানোর চিন্তা করা হতো না। উৎপাদন করা হতো সবার সিদ্ধান্ত ও অংশগ্রহণের মাধ্যমে, লাভকে ঘৃণার চোখে দেখা হতো। কিন্তু এখন যখন ব্যবসা-বাণিজ্যের বিকাশ ঘটলে, 'ব্যবসার প্রয়োজনে উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটল' লাভের জন্য এখন কৃষিজ উৎপাদন করা শুরু হলো। জমিদার এখন ভূমিদাস ও কৃষকদের থেকে ব্যক্তিগত সেবা বা দ্রব্যের আকারে প্রাপ্য নেওয়ার পরিবর্তে অর্থের আকারে তা চাইতে লাগলো। জমিদার তার কর্তৃত্বাধীন খামারকে আরো লাভজনক করার জন্য খামারের দেখা শোনার ভার কর্মকর্তা কর্মচারীর দায়িত্বে ন্যস্ত করল এবং নিজে শহরে বসবাস করে ব্যবসা বাণিজ্যে মনোনিবেশ করলো। খামারের কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে নির্দেশ দেওয়া হলো তারা যেন যত বেশি সম্ভব কৃষকদের কাছ থেকে কর আদায় করে। এই ব্যবস্থার ফলে কৃষকের দুর্দশা বেড়ে গেলো। **প্রথমতঃ** তারা তাদের যা কিছু স্বাধীনতা ছিল তা হারিয়ে পরনির্ভরশীল কৃষি শ্রমিকে পরিণত হলো। **দ্বিতীয়তঃ** জমিদার শহরে বসবাস করার ফলে জমি পুঁজিবাদী নীতিতে বা লাভের জন্য চাষবাস হওয়ার ফলে এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নির্যাতনে চাষীর জীবনে যে দুঃখ-কষ্ট নেমে আসে তা জমিদার সচক্ষে দেখতে পারছিলো না। জমিদার ও চাষীর মধ্যে যে পিতৃবৎ সম্পর্ক ছিল শুধু তাই ভেঙ্গে গেলো

না, জমিদার চাষীর জীবনযাত্রার মানের মধ্যে পূর্বে যা তফাৎ ছিল এখন তা আরো বিস্তৃত হলো। ধনী জমিদার আরও ধনী হলো, গরিব চাষী আরো গরিব হলো। তবে এই ব্যবস্থায় উৎপাদন যে বাড়ল তা নিসন্দেহ।

খ) বেষ্টনী প্রথার আন্দোলন (Enclosure Movement**)**

প্রথমে ইংল্যান্ডে এবং পরে ইউরোপের অন্যান্য দেশে কৃষি জমিতে এক ধরনের বেষ্টনী দেয়ার প্রথা চালু হয় এবং পরে তা একটা আন্দোলনে পরিণত হয়। এই আন্দোলন বা এনক্লোজার মুভমেন্টের সূচনা হয় দূর দেশে ইংল্যান্ডের ভেড়া থেকে আহরণ করা উলের চাহিদা বৃদ্ধির কারণে। মধ্যযুগে একটা ম্যানরে জমি চারভাবে বিভক্ত ছিল, তিনটিতে গম ও বার্লি রোপন করা হতো। চতুর্থটি খালি রাখা হতো, কমন ল্যান্ড (Common Land) বা এজমালি জমি বলে পরিচিত এই ভূখন্ড সবার জন্য উন্মুক্ত ছিল। এখানে গ্রামের সবাই তাদের গরু ভেড়া চরাত। উলের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় জমিদার জমি খ্যলি রাখাকে অপচয় মনে করতে লাগলো। জমিদার এই কমন ল্যান্ডের চারপাশে বেড়া দিয়ে ভেড়া পালনের জন্য নির্দিষ্ট করে দিলো। কৃষিকাজ করা থেকে ভেড়াপালন সহজতর ছিল। লোকবলের প্রয়োজন কম হতো, সর্বোপরি এর থেকে আয়ও ছিল প্রচুর। ক্রমেই মুনাফার লোভে জমিদার শষ্যের আবাদি জমিকে বেষ্টনী দিতে শুরু করল এবং অবস্থানরত কৃষকদেরকে উৎখাত শুরু করলো। ইংল্যান্ডের পার্লামেন্ট প্রথমে বেষ্টনি আন্দোলনকে বাঁধা দেয়ার চেষ্টা করল পরে, এই পার্লামেন্টই বেষ্টনী আন্দোলনের বড় সমর্থক হয়ে উঠল। জমিতে বেষ্টনী থাকলে বেশ কিছু সুবিধা পাওয়া যেত। দলভ্রষ্ট গরু ভেড়ার আক্রমণ থেকেই এটা খামারের ফসলকে রক্ষা করল না, জমিদারকে তার মালিকানাধীন জমি সম্পর্কেও সুস্পষ্ট ধারনা দিল। পরবর্তী সময়ে এই প্রথা চাষ পদ্ধতি ও বিভিন্ন ফসল চাষ সম্পর্কে পরীক্ষা নিরীক্ষার সুযোগ দিল। ইংল্যান্ডে এক সময় যে কৃষি বিপ্লব সংগঠিত হলো তার পিছনে বেষ্টনী আন্দোলন বড় ভূমিকা রাখে। তবে বেষ্টনী বা এনক্লোজার আন্দোলন সাধারণ চাষীর জন্য দুর্দশা বয়ে নিয়ে এলো। ম্যানোরিয়াল ব্যবস্থায় ফসলের জন্য নির্ধারিত জমিতে কি ফসল বা কোনো জমিতে তা ফলবে তার সিদ্ধান্ত নেওয়া হতো যৌথভাবে। এখন কৃষক এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার হারালো। প্রথাগতভাবে প্রত্যেক চাষী এমনকি প্রান্তিক চাষীর এজমালি বা কমন জমির উপর অধিকার ছিল, সেখানে সে গরু চরাতো, মাছ ধরত বা প্রয়োজনীয় কাঠ সংগ্রহ করত। এই এক ধরনের সামাজিক স্বাধীনতা যা সে সব সময় ভোগ করত তা নতুন ব্যবস্থায় সে হারালো। প্রান্তিক চাষী (cottagers) বা বিনা স্বত্বে জমির অধিকারীরা (squatters) এখন ভূমিহীন কৃষকে পরিণত হলো।

গ) নতুন শষ্যের আবাদ

আমেরিকা হতে আগত দুটো নতুন শষ্য আলু ও ভূট্টা ইউরোপের কৃষিতে নিয়ে এলো ব্যাপক বৈচিত্র্য। ইউরোপে জনসংখ্যা বাড়ছিলো, আর খাদ্যের চাহিদা ক্রমান্বয়ে উর্ধ্বগামী হচ্ছিল। এখন আলু এবং ভূট্টা খাদ্য তালিকায় যুক্ত হয়ে গরীব মানুষের পুষ্টি চাহিদা জোগান দিতে শুরু করলো। যেহেতু ভূট্টা রোদ্র উজ্জল এবং শুকনো আবহাওয়ায় ভালো জন্মায় তাই ইতালি ও দক্ষিণ-পূর্ব-ইউরোপে এর আবাদ ছড়িয়ে পড়ল। একটি সাধারণ শষ্যের মোচায় যেখানে চারটি দানা থাকে, ভূট্টার একটি মোচায় আশিটি দানা পর্যন্ত ফলন দেয়। 'যাদুর শষ্য' হিসাবে ভূট্টা চাষীর গোলা ভরিয়ে দিলো। আলুও 'যাদুর' ফসল হিসাবে স্বীকৃতি পেল। যেখানে অন্য ফসল হতে চায়না এমন বালুকাময় মাটি অথবা ভিজা মাটিতে আলু ভালো হয়। এফসলের আরো

সুবিধা এই যে অল্প জমিতে এটি চাষ করা যায়। প্রথমে ইউরোপে অনেকে আলুকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়। অনেকের আপত্তি যে এটার উল্লেখ বাইবেলে নেই। কারো কারো মধ্যে কুসংস্কার ছিল যে এটা কুষ্টরোগ ছড়ায়। এরপরও ক্রমান্বয়ে আলু জনপ্রিয় খাদ্য হিসাবে ছড়িয়ে পড়ে।

শিল্প ক্ষেত্রে অগ্রগতি

(ক) গিল্ড ব্যবস্থার প্রাধান্য লোপ

ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির ফলে পন্য উৎপাদন ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক পরিবর্তন এলো। মধ্যযুগে বিভিন্ন পণ্যের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করত বিভিন্ন পেশার কারিগরদের সংগঠন গিল্ড। গিল্ড পণ্যের উৎপাদন ও বন্টনের সব দিক নিয়ন্ত্রণ করত। গিল্ড দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ করত, কোন সদস্য ঐ নির্ধারিত মূল্য থেকে কম দামে পণ্য বিক্রি করে অন্য সদস্যকে অসুবিধায় ফেলছে কিনা তা দেখাশুনা করতো। সংগঠনটি সদস্যদের কাজের সময় নির্ধারণ করে দিতো। নির্দিষ্ট সময়ের অতিরিক্ত কাজ করে বেশি ব্যবসা ছিল নিষিদ্ধ। একটা পণ্যের গিল্ডে কতজন শিক্ষানবীশ থাকবে তাও গিল্ড ঠিক করে দিতো। এর উদ্দেশ্য ছিল সদস্যদের জন্য যথেষ্ট কাজের নিশ্চয়তা বিধান। গিল্ডের সদস্য হতে পারতো শুধু মাষ্টার ক্রাফটসমেন (master craftsman) বা ওস্তাদ কারিগর। একজন কারিগর যখন দক্ষতার চরম পর্যায়ে উঠতে পারতেন তখনই তাকে ওস্তাদ কারিগর বলা হতো। ওস্তাদ কারিগর নিজে কাঁচামাল সংগ্রহ করতো, এগুলোকে নিজের পরিবার বা তার অধীন মজুর এবং শিক্ষানবিশের শ্রমকে কাজে লাগিয়ে পণ্যে রূপান্তরিত করে নিজের আঙ্গিনায় বিক্রি করতো। গিল্ডের নিয়ন্ত্রণের বাইরে ওস্তাদ কারিগরের উৎপাদন করা ছিল অসম্ভব। কিন্তু ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলে ব্যবসা বাণিজ্যের ব্যাপক উন্নতি হওয়ায় পণ্যের চাহিদা বাড়তে লাগলো। গিল্ড গুলি সারাবিশ্বের চাহিদা পূরণের জন্য পণ্য উৎপাদন এবং বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে প্রবাহিত কাঁচামালের মোকাবিলায় ছিল খুবই অসহায়। গিল্ডের বাইরে অনেক কারিগর এখন উৎপাদন শুরু করলো। গিল্ডের আওতা বর্হিভূত কারিগররা নিজেদের স্বাধীনতাকে কাজে লাগিয়ে সম্পদশালী হতে লাগলো। অনেক গিল্ডের মজুর (journeyman) এবং শিক্ষানবীশ ওস্তাদ কারিগর হওয়ার স্বপ্ন বাদ দিয়ে ভাড়ায় খাটা মজুরে রুপান্তরিত হয়। কিছু কিছু গিল্ড অস্তিত্ব রক্ষার জন্য প্রবেশাধিকার ফি বা প্রবেশের যোগ্যতাকে বাড়িয়ে দিয়ে নিজেদের স্বাতন্ত্র বাড়িয়ে তোলে। মজুর ও শিক্ষানবীশদেরকে বেশি করে শোষণ করে এবং বিশাল বাজারের চাহিদা মিটিয়ে সম্পদশালী হতে থাকে।

(খ) পুটিং আউট বা অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ব্যবস্থা (putting out or Domestic system**)**

নতুন যুগের চাহিদার প্রেক্ষাপটে গিল্ড ব্যবস্থার উৎপাদন ও বন্টনের উপর আরোপিত নিয়ন্ত্রণ এড়িয়ে নতুন উৎপাদন ব্যবস্থা ইউরোপে জায়গা করে নিলো। এই ব্যবস্থাকে পুটিং আউট বা অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ব্যবস্থা বলা হয়। এই ব্যবস্থার অধীনে একজন উদ্যোক্তা তার খাটানো পুঁজির সর্বোচ্চ মুনাফার জন্য কাঁচামাল যেমন, তুলা বা শন (flax) বুননের জন্য গ্রামীণ কারিগর ও শ্রমিকদের সরবরাহ করত। এর জন্য কারিগর ও শ্রমিকদেরকে মজুরি দেওয়া হতো। বুননের কাজ হয়ে গেলে উদ্যোক্তা বুনন করা সুতা গ্রামীণ তাঁতীদেরকে কাপড় বানানোর জন্য দিতো। কাপড় তৈরি হলে উদ্দোক্তা ঐগুলো রঙ বা ডিজাইন করার জন্য রঙের বা ডিজাইনের কারিগরদেরকে দিতো। উৎপাদনের প্রত্যেকটি পর্যায়ে শ্রমের ভিত্তিতে মজুরি

নির্ধারিত হতো। পণ্য বিক্রির জন্য তৈরি হওয়ার পর উদ্দোক্তা এগুলি পাইকারি বিক্রেতা বা নিজস্ব দোকানে তার খরচ পুঁষিয়ে লাভে বিক্রি করতো। ত্রয়োদশ দশকে ইতালিতে এই প্রথা শুরু হয়, পরে রাইনের উপত্যকা ছাড়িয়ে Flanders (ফরাসী অঞ্চল) এবং ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করে ইংল্যান্ডে প্রবেশ করে।

উৎপাদন পদ্ধতির এই নতুন ব্যবস্থা কতগুলি কারণে জনপ্রিয় হয়ে উঠে। উদ্যোক্তা এই ব্যবস্থার ফলে আগের চেয়ে বড় এলাকায় তার পণ্য দ্রব্য ছড়িয়ে দিতে পারতো। তাছাড়া উদ্যোক্তা ভূমি থেকে উৎখাত হওয়া চাষী, ভূমিদাস ও তাদের স্ত্রীদেরকে সস্তায় কাজে লাগাতে পারতো। গিল্ডের মতো শুধুমাত্র দক্ষ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শ্রমিকদের কাজে লাগানোর প্রতিবন্ধকতা থেকে উদ্যোক্তা রক্ষা পেলো। তদপুরি এই ব্যবস্থায় উদ্যোক্তার পুঁজি বেশী বিনিয়োগ হওয়ায় উৎপন্ন দ্রব্য জমিয়ে সুবিধাজনক দামে বিক্রি করার সুযোগ পেলো। এছাড়া উদ্যোক্তা যন্ত্রপাতি কিনে পুঁজির টাকা আটক রাখার ঝামেলা থেকে রক্ষা পেলো, কেননা এই ব্যবস্থায় শ্রমিকদেরকে নিজ খরচে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি জোগাড় করতে হতো।

গ্রাম্য শ্রমিকরা এ ব্যবস্থাকে দারিদ্র্য বিমোচনের উপায় হিসেবে স্বাগত জানালো। অজন্মা, খরা ইত্যাদি কারণে ফসল নষ্ট হয়ে গেলে চাষী পূর্বের মতো না খেয়ে মরার ভয় থেকে রক্ষা পেলো। এই ব্যবস্থায় শ্রমিকের কাজের সঙ্গে সঙ্গে তার পরিবারের অন্য সদস্যদেরও কাজের সংস্থান হলো। যেমন কাপড় বুননের কাজে ছোট্ট শিশুটিও নিয়োজিত হতে পারলো। অতিরিক্ত আয়ের বাইরে পারিবারিক উৎপাদন ব্যবস্থায় আরো কিছু সুবিধা ছিলো। এখন গ্রামের শ্রমিক তার সময়ের মূল্যবান ব্যবহার করতে পারলো। অর্থাৎ ফসল বুনা বা ফসল তোলার সময় শ্রমিকের কৃষিকাজ বেড়ে গেলে সে তখন কারখানার কাজ বাদ দিয়ে কৃষিতে পুরোপুরি নজর দিতে পারতো।

পারিবারিক উৎপাদন ব্যবস্থায় বেশ কিছু অসুবিধাও ছিলো। আলো বাতাসহীন গরীব শ্রমিকের ঘর কারখানার কাজের জন্য প্রায়ই উপযুক্ত ছিল না। অনেক সময় যে ঘরে শ্রমিক থাকত সে ঘরে উৎপাদনকারী তার যন্ত্রপাতি সরঞ্জামাদি রাখতো। আরেকটা অসুবিধা হলো অনভিজ্ঞ উদ্যোক্তার হাতে শ্রমিক প্রায়ই জিম্মি হয়ে থাকতো। মাঝে মাঝে বাজারের চাহিদা বুঝতে না পেরে অনভিজ্ঞ উদ্যোক্তা বুননকারী এবং তাঁতীদেরকে প্রচুর অর্ডার দিতো। কিন্তু চাহিদা পড়ে গেলে তাদের কাজ বাতিল করে দিতো।

নতুন এই উৎপাদন ব্যবস্থাপনায় পুঁজি এবং শ্রমের মধ্যে যে পার্থক্য ছিল তা আরো সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো। ক্রমান্বয়ে শ্রমের উপর পুঁজির আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হতে লাগলো। দক্ষ কারিগর ও শিক্ষানবীশ শ্রমিকের মধ্যে যে একটা মানবিক সম্পর্ক ছিল তা ক্ষীণ হয়ে গেলো।

সারসংক্ষেপ

ভৌগোলিক আবিষ্কারের পথ বেয়ে যে বাণিজ্য বিপ্লব সংগঠিত হলো, তার সঙ্গে তাল মিলাতে গিয়ে কৃষি এবং শিল্পের উৎপাদন ব্যবস্থাও পরিবর্তিত হয়ে গেলো। অধিক লাভের জন্য কৃষি ও পণ্য দ্রব্য উৎপাদিত হতে লাগলো। কৃষিতে ম্যানর ব্যবস্থা ভেঙ্গে জমি বেষ্টনী আন্দোলনের শুরু হয়। শিল্পে গিল্ড ব্যবস্থার প্রাধান্য লুপ্ত হয়ে ঘরোয়া উৎপাদন পদ্ধতির সৃষ্টি হলো। এই সব পরিবর্তনে ইউরোপের উৎপাদন বহুগুণ বেড়ে গেলো এবং মানুষের জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পেলো। কিন্তু এতে সাধারণ কৃষক ও শিল্প মজুরদের জীবন খুব সুখকর হলো না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। ম্যানর ব্যবস্থায় উৎপাদন ছিল
(ক) বেশি লাভের জন্য (খ) অল্প লাভের জন্য
(গ) চাহিদার তুলনায় বেশি উৎপাদনের জন্য (ঘ) চাহিদা অনুযায়ী

২। বেষ্টনী প্রথার আন্দোলন শুরু হয়।
(ক) উলের চাহিদার জন্য (খ) গরু ছাগলের হাত থেকে ফসল রক্ষার জন্য
(গ) ভালো সেচের জন্য (ঘ) কৃষিজ উৎপাদন বাড়ানোর জন্য

৩। গিল্ড নিয়ন্ত্রণ করতো
(ক) পণ্যের উৎপাদন ও বন্টন (খ) শ্রমিকের চাকুরী
(গ) শ্রমিকের বেতন (ঘ) শিক্ষানুবিশদের ট্রেনিং।

৪। পারিবারিক উৎপাদন ব্যবস্থায়
(ক) উৎপাদন হতো ওস্তাদ কারিগরের বাড়িতে (খ) শ্রমিকের বাড়িতে
(গ) কারখানার মালিতকের বাড়িতে (ঘ) দোকানদারের বাড়িতে

রচনামূলক প্রশ্ন

১। কৃষিতে পুঁজিবাদ বলতে কি বুঝায়?
২। পারিবারিক উৎপাদন ব্যবস্থায় উদ্যোক্তা এবং শ্রমিকের কি সুবিধা ছিল?

নৈব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর

১। (ঘ), ২। (ক), ৩। (ক), ৪। (খ)।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. বেষ্টনী প্রথার আন্দোলন কেন বিকশিত হলো আলোচনা করুন।

২. গিল্ড ব্যবস্থার প্রধান্য নষ্ট কেন হলো আলোচনা করুন।

সহায়ক গ্রন্থাবলী

Walter Wallbank, Civilization past and Present. (Southern California, 1956).